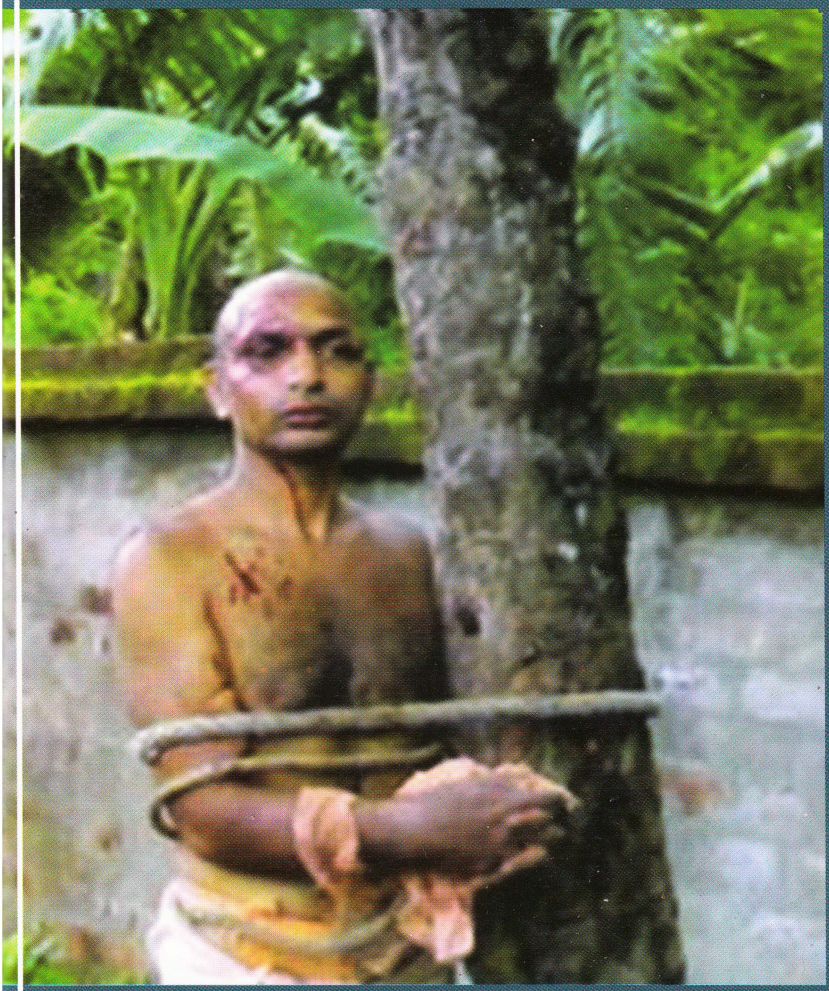
প্রসঙ্গ ঃ উদ্বোধন পত্রিকার নির্বোধ প্রবন্ধ



ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

''ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা বাইরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা।''

বাবাসাহেব আম্বেদকর, Pakistan or Partition of India, Government of Maharastra Publication, 330.

''মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার। ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। অমুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য।''

আনোয়ার শেখ, Islam - Principality Publications (UK), 28.

''মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে? কোন অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তার গলা কাটা যাবার সম্ভাবনাই দেখা দেবে।''

স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞানযোগ

''তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র, 'আল্লা এক এবং মহম্মদই এক মাত্র পয়গম্বর'। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূক্ত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।''

স্বামী বিবেকানন্দ, Practical Vedanta

''জিহাদের অর্থ হল, পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল বিধর্মী কাফেরদের দখলে রয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলকে জয় করা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র কোরানের আইন বা কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের অন্তিম লক্ষ্য।''

আয়াতুল্লা খোমেনি

প্রসঙ্গ :
উদ্বোধন পত্রিকার
নির্বোধ প্রবন্ধ

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

সেভ ইন্ডিয়া মিশন

Prosonga : Udbodhon Potrikar Nirbodh Probandho
By Dr. Radhasyam Brahmachari

Price : Rs. Twenty only

প্রকাশক ঃ
সেভ ইন্ডিয়া মিশন

প্রথম প্রকাশ ঃ মকর সংক্রান্তি, ১৪১৭

প্রচ্ছদ ঃ সম্রাট পাল

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোরেরহাটে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সাধু স্বামী পুণ্যলোকানন্দ-কে স্থানীয় মুসলমানরা গাছে বেঁধে বেদম প্রহার করে। মুসলমানরা ওই আশ্রমের একটি ঘর অসামাজিক কাজের জন্য দাবি করলে স্বামীজী অস্বীকার করায় এই ব্যবস্থা।

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রণ ব্যবস্থা ঃ
প্রয়াস
২৪৭/বি, এ. পি. সি. রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

যে সব অগণিত হিন্দু বীর নৃশংস মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন,, যাঁদের আত্মদানের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে এবং অগণিত সেই সব মা-বোন যাঁরা মুসলমানদের হাত থেকে আত্মসম্মান রক্ষার্থে আগুনে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদে পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ নিবেদিত হল।

— লেখক

এটা সকলেরই জানা আছে যে, বেলুড়ে অবস্থিত শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাঙলায় প্রকাশিত মাসিক মুখপত্রের নাম উদ্বোধন। গত বছরের (১৪১৫ বঙ্গাব্দের) উপরিউক্ত পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' নামে একটি অতিশয় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় লেখকের কোন নাম ছিল না। পরে খোঁজ নিজে জানা যায় যে ওটার লেখক হলেন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং। প্রবন্ধের শুরুতে লেখক লিখছেন, ''মানব সমাজে ধর্মের স্থান অতি উচ্চে। পরস্পরবিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট মানবসমাজকে একত্রে গ্রথিত করিয়াছে ধর্ম। ধর্ম মানবকে নানা প্রকার অন্যায় ও দুষ্প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ধর্ম এক মানবকে অপর মানবের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। ঐহিক ও পারমার্থিক ক্ষেত্রে ধর্মই মানবের প্রধান অবলম্বন। অপরপক্ষে ধর্মের নামে মানবকুল যেকালে অন্ধ হইয়া ওঠে, সেইকালে অনাচার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না।''

তবে লেখকের মত হল, মানুষের অনাচারের জন্য ধর্মকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। তাই তিনি লিখছেন, ''প্রকৃত ধর্ম চিরকাল মহান ও উদার। ধর্ম তাহার পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও সার্বজনীন আদর্শের দ্বারা ছিন্নভিন্ন মানবসমাজকে একীভূত করিতে পারে।'' তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, মানবসমাজে এত বিবাদ, ঝগড়াঝাটি কেন? তা বোঝাতে লেখক লিখছেন, ''অন্যদিকে উক্ত ধর্মের নামে সমাজে যখন কুসংস্কার, অনুদারতা ও সংকীর্ণতা প্রবল হইয়া ওঠে, তখন মানব নানা কৌশলে পরস্পরের সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া বিভেদের সৃষ্টি করে এবং ধর্মের সেবার নামে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকে। কেন এইরূপ হয়? ধর্মের মূল নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে মানবের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে এইরূপ হইয়া থাকে।''

তারপর লেখক লিখছেন, ''প্রত্যেকে দাবি করিয়া থাকে যে, তাহার ধর্ম অনাদি ঈশ্বর হইতে আগত। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বিভিন্ন ধর্ম কেন পরস্পর বিরোধী হইবে? ধর্মের মূল বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব যে, কোন ধর্মই কাহারো বিরোধী নহে। যুগের প্রয়োজন অনুসারে, এক দেশে একজন মহাপুরুষ যাহা বলিতেছেন, অন্য পরিবেশে অপর একজন মহাপুরুষ বাহ্যত অন্য কিছু বলিতেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে বা ধর্মের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে যে, মূলগতভাবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পারস্য

ভাষার কবি হাকিম সানাই বলিয়াছেন, ''ভাষা আমাদের হিব্রু, অথবা সিরীয়, অথবা আরবি হতে পারে, প্রার্থনার স্থান বালকা বা বালসা হতে পারে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? যে-ভাবে, যে-স্থানে ও যে-ভাষায় আমরা প্রার্থনা করি না কেন, আমরা প্রার্থনা করি সেই মহান ঈশ্বরের কাছে।'' ভারতের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-পারসিক-শিখ-ইহুদি যিনি যে ভাবেই ধর্মাচরণ করুন না কেন, তাঁহারা সকলে একই বিধাতাকে স্মরণ করিতেছেন। তাঁহাদের পদ্ধতি বিভিন্ন, পরন্তু প্রার্থনার লক্ষ্য ভিন্ন নহে।''

আমরা এখানে একটু থামবো এবং লেখক এতক্ষণ যা বললেন তা বোঝার চেষ্টা করবো। এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সেমিটিক রিলিজিয়ন অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম এবং ইহুদিদের ধর্ম বা জুদাইসম্ সম্পর্কে লেখকের পাহাড়প্রমাণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই তিনটি সেমিটিক ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখ ধর্মের মত ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রথম, আধ্যাত্মিকতা বলতে যা বোঝায়, ওই তিনটি সেমিটিক ধর্মের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই। তাদের কারবার শুধু এই বাস্তব জগৎ ও ইন্দ্রিয়সুখ নিয়ে। তাই ''ধর্ম তাহার পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও সার্বজনীন আদর্শের দ্বারা ছিন্নভিন্ন মানবসমাজকে একীভূত করিতে পারে।'' লেখকের এই উক্তি উপরিউক্ত সেমিটিক ধর্ম তিনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ে ওই তিনটি সেমিটিক ধর্মের কোন মাথাব্যথা নেই। তৃতীয়তঃ ওই তিনটি ধর্মের মধ্যে খ্রিস্টমত ও ইসলামের উদ্দেশ্য হল, সোজা কথায় বুঝিয়ে এবং প্রয়োজনে অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে অনুগামীদের সংখ্যা বাড়ানো এবং অন্তিম লক্ষ্য হল, এইভাবে সংখ্যা বাড়িয়ে ধর্মীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। চতুর্থতঃ ইসলাম বা খ্রিস্টমত হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের মত ধর্মমত নয়। ওগুলো হল রাজনৈতিক মতবাদ।

এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আজ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী ''যত মত তত পথ'' এর অপব্যাখ্যার এক মস্ত প্রচারক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে যৎ সামান্য অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, ঠাকুর তাঁর বাণী ''যত মত তত পথ'' এর মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের যে শাখা প্রশাখাগুলো রয়েছে, যেমন শাক্ত, শৈব,

গানপত্য, বৈষ্ণব ইত্যাদি, এগুলো সব সমান এবং এর যে কোন একটাকে অনুসরণ করে মোক্ষ লাভ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম যদি দেব-ধর্ম হয়, তাহলে গীতা অনুসারে খ্রিস্টমত ও ইসলাম হল আসুরিক ধর্ম। তাই ঠাকুরের পক্ষে কখনই বলা সম্ভব ছিল না যে, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টমত, ইসলাম ইত্যাদি সবই সমান।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত বা মাস্টার মশাই হলেন এই বিভ্রান্তির স্রষ্টা। তিনি তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন যে, ঠাকুর বলে গিয়েছেন যে, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টমত, ইসলাম ইত্যাদি সবই সমান। শ্রীশ্রী ঠাকুর নাকি এও বলে গিয়েছেন যে, হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা একই পুকুর থেকে জল খাচ্ছে, কিন্তু হিন্দুরা বলছে জল, মুসলমানরা বলছে পানি আর খ্রিস্টানরা বলছে ওয়াটার। অনেকেই মহেন্দ্র গুপ্তের এই বর্ণনাকে বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন যে, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" যেন ঠাকুরের রোজ নামচা বা ডায়েরি এবং তা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তার হুবহু সঙ্কলন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়।

সকলেরই জানা আছে যে, শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তাই স্কুলের কাজ সেরে তাঁর পক্ষে রোজ দক্ষিণেশ্বর যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে কালে দক্ষিণেশ্বরে যাবার এক মাত্র যানবাহন ছিল নৌকা। তাই স্কুল ছুটির পর নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সেদিনই ফিরে আসা ছিল এক অসম্ভব কাজ। কাজেই শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় শুধু রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতেই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরের কথা লিখে নিতেন। সেই সঙ্গে ঠাকুর অন্যান্য দিন কি বলেছেন তা অন্যান্য ভক্ত ও চাকর বাকরদের কাছ থেকে মোটামুটি জেনে নিতেন এবং লিখে নিতেন। পরে বাড়ি ফেরার পর সেই সব টুকরো টুকরো কথাকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সাজিয়ে গল্প খাড়া করতেন। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এভাবেই তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলমানের এক পুকুর থেকে জল খাবার গল্প তৈরি করেছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রামকৃষ্ণ মিশনের নির্বোধ সন্ন্যাসীরাও মহেন্দ্র গুপ্তের সেই ভুল ব্যাখ্যাকে রাজনৈতিক এবং আর্থিক লাভের খাতিরে মহাসত্য বলে প্রচার করে চলেছেন। সব থেকে বড় কথা হল, "যত মত তত পথ" এর ভুল ব্যাখ্যার ব্যাপারে স্বামীজী যথা সময়ে এই সব সন্ন্যাসীদের সতর্ক করে দিয়ে

গিয়েছেন। তিনি "Rules and Regulations of the Ramkrishna math" গ্রন্থে বলে গিয়েছেন যে, যে মাত্র একদিন গিরগিটি দেখে, সে গিরগিটির মাত্র একটা রঙই জানে। কিন্তু যে গাছে গিরগিটি বাস করে সেই গাছের তলায় যে বাস করে, সে গিরগিটির সব রঙই জানে। তাই যাঁরা ঠাকুরকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, এক মাত্র তাঁদেরই ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লেখার অধিকার আছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যেই আদর্শকে সামনে রেখে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাই স্বামীজীর সেই আদর্শকে পদদলিত করছেন।

স্বামীজী উপরিউক্ত "Rules and regulations of the Ramkrishna Math" গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে লিখে গিয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্যই শ্রীশ্রী ঠাকুর এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের একটা প্রধান কাজ হল, যে সব হিন্দু এক কালে পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে এ রকম কোন প্রচেষ্টা আছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু স্বামীজীর রচনাবলীতে যেখানে যেখানে সেমিটিক ধর্মগুলি, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে বাস্তব সম্মত সঠিক মন্তব্য আছে, সেগুলোকে বেমালুম মুছে দিচ্ছেন বা বিকৃত করছেন। কারণ, ওই সমস্ত উক্তি বর্তমান মুসলমান তোষণকারী ভন্ড সেকুলার রাজনৈতিক মতবাদের পরিপন্থী।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সরকারি অনুদানের লোভে মহেন্দ্র গুপ্ত কৃত "যত মত তত পথ" এর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রচার করতে মত্ত হয়েছেন, কারণ ওই অপব্যাখ্যা আজকের মুসলমান তোষণকারী মেকি সেকুলারবাদের সহায়ক। কিন্তু ওই অপব্যাখ্যা যে হিন্দু সমাজকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করছে এবং হিন্দু সমাজের চরম ক্ষতিসাধন করছে, সে ব্যাপারে তাঁদের কোন চিন্তা নেই। পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, কয়েক বছর আগে, সরকারি অনুদান ও আরও কিছু সুযোগ সুবিধার লোভে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আদালতে হলপনামা দিয়ে বলেন যে তাঁরা হিন্দু নন, তাঁরা রামকৃষ্ণাইট। কাজেই তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তাঁদের এই দাবির যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতে বিষয়টা শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যায়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের একটি স্পেশাল বেঞ্চ তাঁদরে সেই অযৌক্তিক দাবি চরম ঘৃণার

সঙ্গে খারিজ করে দেয়। এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলে রাখা উচিত হবে। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে কোন্ হিন্দু মারা গেলে সে তার কৃত কর্ম অনুসারে ব্রহ্মলোক, বা বিষ্ণুলোক, বা চন্দ্রলোকে যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বলেন যে তাঁরা মারা গেলে রামকৃষ্ণলোকে যান। এ সব কথা শুনলে মনে হয় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বর্গে গিয়ে একজন বড় প্রোমোটার হয়েছেন এবং সেখানে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের জন্য রামকৃষ্ণলোক নামে বিশাল এক হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করে রেখেছেন।

যাই হোক, "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" প্রবন্ধের লেখক তারপর লিখছেন, "ইহা সত্য যে, হিন্দু ধর্মের ক্রিয়াকান্ড মুসলমান সমাজের ক্রিয়াকান্ড হইতে পৃথক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে ক্রিয়াকান্ড পৃথক হইলেও দুই ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদিগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বলিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা সর্বদা রাজনৈতিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন। ভারতবর্ষের জনজীবনের মূল ভিত্তি রাজনীতি নহে, ভারতীয় জনজীবনের ভিত্তিভূমি ধর্ম। আমরা যদি রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতাম, তাহা হইলে সত্যকার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বহুদিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মগুলি সম্পর্কিত বহু দ্বিধা ও সংশয় যথার্থ নহে। সেইকালে ধর্ম আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে না, পক্ষান্তরে একত্র হইতে সাহায্য করিবে।"

লেখক তারপর লিখছেন, "ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন ধর্ম লইয়া বিচার করিলে আমরা প্রত্যক্ষ করিব যে, প্রত্যেক ধর্মের মধ্য দিয়া একটি ঐক্যের ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কোন্ অতীতে বেদ-উপনিষদ উদীত হইয়াছিল! প্রাচীনকালে ঋষিগণ এক মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে তথা ব্রহ্মে আত্মবিলয় করিয়াছিলেন! যুগ হইতে যুগান্তরে উক্ত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। কত জাতির উত্থান হইল, তাহারা কালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। তথাপি বেদ-উপনিষদের ধারা আজিকার দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রহিয়াছে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্যালেস্টাইনের এক কুটিরে যিশুখ্রিস্ট আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বর্গস্থ পিতা তথা এক ঈশ্বরের উপাসনার উপরই গুরুত্ব আরোপ করিলেন। তাহার

সার্ধষষ্ঠশততম বৎসর পরে আরবের ঊষর বক্ষে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইল। তিনি একই বস্তু তথা আল্লাহর মহান বাণী ভিন্নভাবে প্রচার করিলেন। প্রতিটি ধর্মের বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের উপর দেশ, কাল ও পাত্র প্রভাব বিস্তার লাভ করিলেও অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে একই ধারা-একই আদর্শের অবিচ্ছিন্ন স্রোত। ধর্মের ক্রমান্বয়ের ইতিহাস বলিতেছে, বিভিন্ন ধর্ম পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে না। পরম করুণাময় ঈশ্বর এবং প্রেমময় আল্লাহ্-র মহান বার্তাবহগণ যুগে যুগে দেশে দেশে উক্ত প্রেমের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। দুর্গত মানবতার কান্ডারী। ধরায় ইসলাম-জগৎ উক্ত প্রেমের পথেই প্রেম বিতরণের সর্বকনিষ্ঠ পথিকরূপে সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয় সমাজে পদার্পণ করিয়াছে।"

যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই উপরিউক্ত প্যারাগ্রাফটি পাঠ করলে এই ভেবে আতঙ্কিত হবেন যে, স্বামীজীর মত মহান ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের মত বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আজ কতগুলি অর্ধশিক্ষিত নির্বোধ মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাঁরা বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে, কি করে উদ্বোধন-এর মত একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় এ রকম একটি নির্বোধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে পারে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, কি করে ইসলাম-বিষয়ে এক মহামূর্খ ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের উপর একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখতে উদ্যোগী হতে পারে এবং তার সেই মূর্খতায় পরিপূর্ণ প্রবন্ধ উদ্বোধনের মত পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে! উপরিউক্ত লেখার মধ্য দিয়ে এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই লেখাটি লেখার আগে লেখক ইসলামের মূল গ্রন্থ কোরানখানাও পড়ে দেখা প্রয়োজন মনে করেননি। যদি তার কোরান পড়া থাকতো, তাহলে তিনি কখনোই লিখতে পারতেন না যে, ধরায় ইসলাম-জগৎ উক্ত বেদ-উপনিষদের প্রেমের পথেই প্রেম বিতরণের সর্বকনিষ্ঠ পথিকরূপে সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয় সমাজে পদার্পণ করেছে।

এটা সকলেরই জানা আছে যে, এই বিশ্বে উপনিষদই হল একমাত্র গ্রন্থ যে গ্রন্থ বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করে। উপনিষদই হল একমাত্র গ্রন্থ যে গ্রন্থ বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে বিশাল এই বিশ্ব-মানব সংসারের একজন সদস্য ও পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করে। উপনিষদই হল একমাত্র গ্রন্থ যে গ্রন্থ মানুষে মানুষে সমস্ত রকম ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বিভেদ দূর করে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-মানবতার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ কোরানের মূল ভিত্তি হল ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। কোরান বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা বলে না, বরং

বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজকে কোরান সরাসরি দুইটি দলে বিভক্ত করে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলীম মৌলভি ও উলেমাগণ এই মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন যে, "ইসলাম" (প্রকৃত উচ্চারণ এছলাম) শব্দের অর্থ হল শান্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শব্দের অর্থ হল আত্মসমর্পণ। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, ইসলাম শব্দের অর্থ হল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। ইসলামী মতে, যারা আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে, তারা হল ইমানদার মুসলমান বা মোমেন। আর যারা তা করে না, তারা সবাই হল অতিশয় ঘৃণীত কাফের।

কাজেই, ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে প্রতিটি অ-মুসলমান হল কাফের। আল্লার দৃষ্টিতে এই কাফেররা হল অতি জঘন্য মনুষ্যেতের জন্তু বিশেষ। এরা স্বর্গে যেতে পারবে না, এরা সবাই নরকগামী হবে। এই ঘৃণ্য কাফেরদের উপর যে কোন প্রকার জঘন্য অত্যাচার করার অধিকার আল্লা মুসলমানদের দিয়ে রেখেছেন। কাফেরদের হত্যা করে, তাদের ও তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের সহায়-সম্পদ লুট করা, তাদের জমি-জায়গা বলপূর্বক দখল করা, তাদের রমণীদের লুটের মাল হিসাবে বন্দি করা ও তাদের উপর বলাৎকার করা, তাদের শিশুদের আছাড় দিয়ে মাথার খুলি গুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কোরানে আল্লা এও বলে রেখেছেন যে, যেসব মুসলমান কাফেরদের উপর এইসব অত্যাচার করবে, শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন তিনি সেইসব মুসলমানকে নানাভাবে পুরস্কৃত করবেন।

তাই কোরান বলছে, "আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জ্বিন ও মানব সৃষ্টি করেছি,—তারা পশুর ন্যায়" (সুরা ৭। আয়াৎ ১৭৯)। "নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের নিশ্চয়ই আমি নরকানলে প্রবেশ করাব, যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হবে, আমি তাদের চামড়া বদল করে (নতুন চামড়া) দেব, যাতে তারা চরম শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে" (৪।৫৬)। "যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসরণ করলে তা কখনও গৃহীত হবে না। এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্থগণের অন্তর্ভুক্ত হবে' (৩।৮৫)। "আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করছি। অতএব তাদের গর্দানে আঘাত কর" (৮।১২)। "অত এব তাদের মস্তকসমূহ ছিন্ন কর, তাদের অঙ্গুলীসমূহ কর্তন কর। এটাই তাদের শাস্তি কারণ তারা আল্লা ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল। যারা আল্লা ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে"

(৮।১৩)। "আল্লা অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না" (৩।৫৭)। "অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ বিগত হলে অংশীবাদীদের (মূর্তি পূজকদের) যেখানে পাবে বধ করবে; তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে" (৯।৫)।

কাজেই, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইসলাম হল চরম এক ঘৃণার তত্ত্ব। আল্লা নিজে অ-মুসলমান কাফেরদের যার পর নাই ঘৃণা করেন এবং তাঁর অনুসরণকারী মুসলমাদেরও তা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই কারণে কাফেরদের উপর যে কোন রকমের জঘন্য অত্যাচার করতে তিনি মুসলমানদের অধিকার দিয়ে রেখেছেন। আল্লা কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে বলেছেন, তাই মুসলমানরা কাফেরদের তাদের আত্মীয় স্বজনের সামনে কুচি কুচি করে কাটে। কাফের রমণীদের তাদের আত্মীয় স্বজনের সামনে ধর্ষণ করে। কাফের শিশুদের তাদের আত্মীয় স্বজনের সামনে আছাড় দিয়ে মাথার খুলি গুড়িয়ে দেয় এবং আরও কত কি। আগেই বলা হয়েছে যে, এইসব কাজের জন্য আল্লা পরলোকে মুসলমানদের নানাভাবে পুরস্কৃত করবেন। যে মুসলমান একটাও কাফের হত্যা করতে সক্ষম হবে, আল্লা সেই মুসলমানকে "গাজী" উপাধিতে সম্মানিত করবেন এবং আল্লার স্বর্গে এই গাজীরা হবে সম্মানিত অতিথি। তারা সর্বোচ্চ স্বর্গ বা জান্নাৎ-ই-ফেরদৌসে চিরকাল থাকার অধিকার পাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, কোথায় হিন্দুর "বসুধৈব কুটুম্বকম্", আর কোথায় ইসলামের ঘৃণা বিদ্বেষ ও কাফের হত্যার তত্ত্ব। তাই একটা গাধার পক্ষেও বলা সম্ভব নয় যে, "বেদ-উপনিষদের প্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী ইসলামের মধ্যেও সমানভাবে, অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।" প্রশ্ন হল, লেখক মহাশয় কি এইসব গর্দভোচিত কথাবার্তা তাঁর অজ্ঞতা বশত লিখেছেন, না কি সব জেনে বুঝে ভন্ড সেকুলারবাদীদের খুশি করে বেশি বেশি সরকারি অনুদানের লোভে লিখেছেন, না কি হিন্দুদের বিভ্রান্ত করার জন্য লিখেছেন। যেই কারণেই লিখে থাকুন না কেন, এইসব মিথ্যা কথা লিখে তিনি অবশ্যই এক অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন সমগ্র হিন্দু সমাজের ধিক্কার অর্জন করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলাম হল একটি রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামী উম্মা হল একটি রাজনৈতিক দল এবং মসজিদগুলো হল সেই রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান হল এই রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাই সমস্ত সুযোগ সুবিধা শুধু তাদের জন্যই সুরক্ষিত। কিন্তু কাফেররা যেহেতু ওই রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়, তাই তাদের কপালে আছে ইহ জগতে মুসলমানদের তরবারির দ্বারা ধড়মুন্ড আলাদা হওয়া আর পরকালে আল্লার নরকের আগুনে অনন্তকাল ধরে দগ্ধ হওয়া। প্রকৃতপক্ষে, আল্লার কোরানে বিশ্বাস করা ও আল্লার রসুল মহম্মদের সত্য ধর্ম গ্রহণ করার ফলে শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন আল্লা সব মুসলমানকে নানাভাবে পুরস্কৃত করবেন। শুধুমাত্র ''লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদুর রসুলুল্লা'' কলেমায় বিশ্বাস করার জন্য আল্লা মুসলমানদের সকল রকম দুষ্কর্ম ক্ষমা করবেন এবং পাহাড়প্রমাণ পাপ মাফ করে দেবেন। সেই কারণে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, দুরাচারী ও পতিত মুসলমানও আল্লার জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে। অপরদিকে দুনিয়ার সমস্ত কাফের, ইসলাম নামক রাজনৈতিক দলের সদস্য না হবার কারণে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

কাফেরদের প্রতি ইসলামী ঘৃণার ব্যাপারে পাঠককে সম্যক অবহিত করতে একটা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া চলতে পারে। ঘটনাটি মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনি তার ''তারিখ-ই-ফিরোজশারী'' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। একদিন মুঘিসুদ্দিন নামে এক কাজি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির রাজসভায় আসে। আলাউদ্দিন তখন সেই কাজিকে জিজ্ঞাসা করল, ''খরজ গৌজার (বা জিজিয়া প্রদানকারী) এবং 'খরজ দিহ্' (বশ্যতার নিদর্শক স্বরূপ কর প্রদানকারী) হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্র মুসলমানদের কি রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ করে?'' জবাবে মুঘিসুদ্দিন বলে, ''তারা হল জিজিয়া প্রদান কারি জিম্মী। জিজিয়া আদায়কারি মুসলমান মুসলমান কর্মচারী তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের উচিৎ হবে সসম্মানে ও বিনয়ের সাথে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করা। সেই কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে নোংরা বা ধুলো ছুড়ে মারে তবে তাদের উচিৎ হবে হা করে তা গিলে ফেলা। এইভাবেই তারা সেই করাদায়কারিকে সম্মান দেখাবে। এইভাবে বিনয়ের সাথে কর দিয়ে এবং বিনা প্রতিবাদে নোংরা গিলে তারা বশ্যতার প্রমাণ দেবে এবং এর

মধ্য দিয়েই ইসলামের গৌরব ও মেকি ধর্মের (অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের) হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন এবং বলেন, ''তাদের সর্বদা পরাধীন করে রাখো।'' হিন্দুদের এইভাবে সদা সর্বদা হীন করে রাখাই আমাদের কর্তব্য, কারণ তারা আল্লার রসুলের (অর্থাৎ নবী মহম্মদের) চিরস্থায়ী শত্রু। তাছাড়া আল্লার রসুল আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, ''তাদের হত্যা কর, লুণ্ঠন কর এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত কর। তাদের দাসত্ব করতে বাধ্য কর।'' ইসলামের মহান টীকাকার হানিফার মত হল, ''হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও'' (অর্থাৎ তাদের জিম্মী হিসাবে গণ্য কর), এবং আমরা সেই মহান হানিফাকেই অনুসরণ করি। অন্যান্য টীকাকারদের মতে হিন্দুদের সামনে দুটো রাস্তা, হয় ইসলাম নয় মৃত্যু।'' বিগত ৭০০/৮০০ বছরের মুসলমান পরাধীনতার আমলে হিন্দুরা কি বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে উপরিউক্ত কথপোকথন তার একটি প্রমাণ্য দলিল। (অধিক জানতে হলে কৌতুহলী পাঠক এই লেখকের ''মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি'' দেখতে পারেন।)

কাজেই এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার যে, ইসলাম নামক চরম এক ঘৃণার, হিংসা ও রক্তপাতের তত্ত্বকে ''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে'' প্রবন্ধের লেখক প্রেম ও ভালবাসার ধর্ম বলে বর্ণনা করছেন। এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এইসব নির্বোধ সাধুর দল তাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের লেখাও পড়ে দেখেননি।

ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামীজী এক সময় বলেন, ''তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র, আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর! যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে, যে কোন পুরুষ অথবা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারকরা হইয়াছে সেগুলোকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।'' (১৯০০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ক্যালিফর্নিয়ার শেক্সপিয়ার ক্লাব অফ পাসাডেনায় প্রদত্ত ভাষণ। বিবেকানন্দ রচনাবলী-৪/১২৫)।

অন্য আরেক প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, ''কোন একটি ধর্মের পক্ষে অতি গোপনীয়

কোন মত প্রচার করা অসম্ভব নয়। যেমন মহম্মদের ধর্ম মুসলমানদের বলছে, যে, "অ-মুসলমান কাফেরদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কোরানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, অ-মুসলমান কাফেররা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের বধ করবে। তাদের অবশ্যই তরোয়াল বা আগুন দিয়ে নিঃশেষ করতে হবে।" কিন্তু যদি একজন মুসলমানকে বলি যে, এ সব কথা খুবই অন্যায়, তখন সে অবশ্যই বলবে, "আপনি তা কেমন করে জানলেন? আমাদের গ্রন্থ এই কথা বলছে।" (১৮৯৬ সালের ১৭ই নভেম্বর লন্ডনে প্রদত্ত ভাষণ। বিবেকানন্দ রচনাবলী-২/৩৩৫। প্র্যাকক্টিক্যাল বেদান্ত।) কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যদি স্বামীজী আজ বেঁচে থাকতেন তবে "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে" প্রবন্ধের লেখককে ইসলাম সম্পর্কে অসত্য প্রচার করে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করার জন্য কষে একখানা থাপ্পড় মারতেন। শুধু তাই নয়, হয়তো তাকে লাথি মেরে আশ্রম থেকেই বিতাড়িত করতেন।

সুতরাং, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কোরান নামক যেই গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই কাফেরদের প্রতি চরম ঘৃণার কথা ও তাদের সমূলে বিনাশ করার কথা লেখা আছে, সে কোরান বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীতে পরিপূর্ণ, এ কথা লেখক লিখলেন কেমন করে! কি করে তিনি লিখলেন যে, বেদ এবং উপনিষদের প্রেমের বাণী কোরান ও ইসলামী তত্ত্বের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। যে কেউ ইসলাম সম্বন্ধে সামান্য কিছুও জানেন, তিনি এইসব কথার মধ্য দিয়ে লেখকের চমর মূর্খতাই আবিষ্কার করবেন। অনেক পাঠকের কাছে যদি তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক একজন পাগল বলে সাব্যস্ত হন, তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। এমন কি, যদি কোন পাঠক এই ধারণা করেন যে, আরবের পেট্রো-ডলারের লোভে এবং মুসলমান তোষণের স্বার্থেই লেখক এ সমস্ত জঞ্জাল লিখেছেন, তবে তাকেও দোষ দেওয়া সম্ভব হবে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে, আর তা হল, "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে" প্রবন্ধের লেখক ইসলামের আল্লাকে বেদান্তের ব্রহ্মের সামার্থক বলে প্রচার করেছেন। মনে হয় ওই নির্বোধ লেখক আর এক নির্বোধের লেখা "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম" গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এটা করেছেন। কিন্তু ওই নির্বোধ লেখকের জানা নেই যে, ঈশ্বর হতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, ইসলামের আল্লার তা নেই। সেই কারণে কোরানও ঈশ্বরের

রচিত গ্রন্থ নয়। আল্লা যদি ঈশ্বর হতেন তবে তাঁর চোখে সব মানুষই সমান হোত, যেমন হিন্দুর ভগবান বলেন, "সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়", অর্থাৎ আমার চোখে সকলেই সমান, কেউ আমার প্রিয়পাত্রও নয়, আবার কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয় (গীতা-৯/২৯)।

কিন্তু আল্লার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান নয়। একমাত্র মুসলমানদের কাছে তিনি রহমানির রহিম বা দয়ালু দয়াময়। কিন্তু অ-মুসলমান কাফেরদের কাছে আল্লা একটি নৃশংস অত্যাচারী ও নির্মম ঘাতক, এক কথায় একজন জল্লাদ বিশেষ। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এইরকম নির্মম, নৃশংস অত্যাচারী ও ভয়ঙ্করভাবে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট আল্লা সমগ্র জীব-জগতের ঈশ্বর হতে পারেন না। সেই কারণেই মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর বিখ্যাত সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে লিখেছেন, "If the God of Quaran had been the protector of all creatures and dispenser of forgiveness and mercy to all, He would not have commanded the Muslims to kill the people of other religions" অর্থাৎ, কোরানের আল্লা যদি সমস্ত জীবের পালন কর্তা এবং দয়াময় ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর হতেন, তবে তিনি মুসলমানদের অন্য ধর্মের সমস্ত লোকদের হত্যা করার আদেশ দিতে পারতেন না। তাই তিনি আরও লিখেছেন, "The Quran does not appear to have been made by God." অর্থাৎ এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, কোরান ঈশ্বর রচিত গ্রন্থ নয়।

এই ব্যাপারে আরবী শব্দ আল্লাহ্-র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু চার কথা বলা সঙ্গত হবে। দুটি আরবী শব্দ আল্ ও ইলাহ্ থেকে আল্লাহ্ শব্দের উৎপত্তি। আরবী আল্ হল ইংরাজী The-র সমার্থক এবং ইলাহ্ হল আরবের একস্থানীয় দেবতা। কাজেই আল্লাহ্ বা আল্লা শব্দের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব সংসারের সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা ঈশ্বরের ভাব ব্যক্ত হয় না, বরং আরবের কোন স্থানীয় দেবতার ভাবই ফুটে ওঠে। অপরদিকে, কোরানের মধ্য দিয়ে আল্লার ব্যবহার ও কাজ কর্মের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, আল্লা কোন দস্যু সর্দার কিংবা অপরাধ জগতের একজন ডন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী উম্মা হল পৃথিবীর বৃহত্তম অপরাধের চক্র এবং আল্লা হল তার উপদেষ্টা ও সর্দার। আল্লা ভগবান নয় এবং মুসলমান জিহাদিদের দ্বারা সন্ত্রাস ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আল্লা নিজেকে ভগবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরপর লেখক বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, যিনিই উপনিষদের ব্রহ্ম, তিনিই কোরানের আল্লা। এটা সকলেরই জানা আছে যে উপনিষদের ব্রহ্ম হলেন নিরাকার। তিনি পুরুষও নন স্ত্রীও নন তাই ব্রহ্ম ক্লীব লিঙ্গ। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত। তার থেকেও বড় কথা হল হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কোন পার্থিব বা প্রাকৃত গুণ ব্রহ্মের নেই। তাই তিনি নির্গুণ। ব্রহ্মের শুধু একটি গুণই আছে, তা হল তিনি চৈতন্যময়। কেন উপনিষদের নিম্নোক্ত চারটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্রহ্মকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা

যদ্বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি.....।। (১/৫)
যন্মনসা ন মনুতে জেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্মা তুং বিদ্ধি.....।। (১/৬)
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি.....।। (১/৭)
যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি.....।। (১/৮)
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি.....।। (১/৯)

অর্থাৎ, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা যাঁকে বর্ণনা করা যায় না, বরং যাঁর দ্বারা বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ উচ্চারিত হয়, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৫)। মন দ্বারা যাঁকে অনুভব করা যায় না, বরং যাঁর সাহায্যে মন তার কার্য করে, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৬)। চক্ষু যাঁকে দেখতে পায় না, বরং যাঁর দ্বারা চক্ষুর দেখার কার্য সম্পন্ন হয়, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৭)। শ্রবণের দ্বারা যাঁকে জানা যায় না, বরং যাঁর দ্বারা শ্রবণের কার্য সম্পন্ন হয়, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৮)। প্রাণ দ্বারা যাঁকে জানা যায় না, বরং যাঁর দ্বারা প্রাণের কার্য সম্পন্ন হয়, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৯)।

যেহেতু মুসলমানরা আল্লার মূর্তি বানিয়ে পুজো করে না, তাই অনেকের ধারণা, বেদান্তের ব্রহ্মের মত ইসলামের আল্লাও বুঝি নিরাকার। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইসলামের আল্লা প্রাকৃত দেহ বিশিষ্ট এবং তাঁর উচ্চতা ৬০ হাত (মুসলীম হাদিস - ৬৩২৫)। উপরন্তু আল্লার মুখাবয়ব মানুষের মত, কারণ আল্লা তাঁর নিজের আদলে প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করেছেন (মুসলীম হাদিস - ২৮৭২)। আর

একটা হাদিসে (মুসলীম হাদিস - ৬৩২৫) বলা হচ্ছে যে, মানুষে মানুষে মারামারি করার সময় কারো পক্ষে অপর জনের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করা উচিত নয়। কারণ আল্লা প্রত্যেক মানুষের মুখমন্ডল তাঁর নিজের মত করে গড়েছেন। এই হাদিসটি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লার চেহারা মানুষের মত। তবে তফাৎ হল এই যে, তাঁর উচ্চতা ৬০ হাত। তবে মনে হয় আল্লা মানুষের কাছে অদৃশ্য থাকেন। কোরানের (৬।১০১) আয়াতে আল্লা ঘোষণা করছেন যে, তাঁর কোন স্ত্রী নেই। কাজেই এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে আল্লা একজন পুরুষ মানুষ।

তবে আল্লা বিশেষ কিছু ক্ষমতা বা কুদরতের অধিকারী। আল্লার কিছু সৃষ্টি করার বাসনা হলে তিনি কুন্ (হও) বললেই তা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তারজন্য কোন কাচামালের দরকার হয় না। কিন্তু হিন্দু দর্শন বলে, "নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধি", বা শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মই হল সৃষ্টির মূল উপাদান। ইসলামী মতে আকাশ হল কঠিন ছাদ এবং আল্লার সৃষ্টি বলেই তা এত নিখুঁত। সেই কঠিন আকাশকে আল্লা তাঁর কুদরতের সাহায্যে, কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্বস্থানে বসিয়ে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন আল্লা তাঁর কুদরতের সাহায্যে সেই আকাশকে ভেঙে গুড়ো গুড়ো করবেন এবং সূর্যকে পৃথিবীর খুব কাছে নিয়ে আসবেন। সেদিন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হবে মাত্র ১ মাইল এবং সেদিন আল্লা সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে আল্লা একজন স্ত্রীহীন পুরুষ মানুষ। শুধু তাই নয়, তিনি সক্ষম পুরুষ এবং কোন মানবীর সঙ্গে সহবাস করে তিনি পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা রাখেন। মহম্মদের জীবিতকালে মদিনার ইহুদি ও খৃস্টানদের মধ্যে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং নবী মহম্মদ সেই বিতর্ক সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিবাদের বিষয় ছিল যিশু আল্লার পুত্র কিনা। খৃস্টানরা দাবি করে যে, যিশু আল্লার পুত্র। কিন্তু ইহুদিরা সেই দাবি মানতে নারাজ। তাই তারা উপহাস করে বলল যে, আল্লা কি তাহলে মরিয়মে গমন করেছিল? খৃস্টানদের দাবির পক্ষে এটা একটা যুক্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু মহম্মদের পক্ষে এই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব হল না, কারণ তাহলে আল্লা পরস্ত্রী গমনকারী বা ব্যভিচারী সাব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষমেশ এই বিতর্কের অবসান করে নবী মহম্মদ বলেন যে, আল্লা যেমন তাঁর কুদরতের সাহায্যে মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেইরকম তিনি তাঁর কুদরতের সাহায্যে মরিয়মের গর্ভে যিশুকে সৃষ্টি করেছিলেন। যাই হোক,

এই বিতর্ক নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামের আল্লা কোন মানবীতে গমন করে পুত্র উৎপাদন করতে সক্ষম একজন পুরুষ মানুষ। (আব্দুল আজিজ আল আমান, কাবার পথে, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯০)।

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লা ৬০ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাকৃত দেহধারী একজন পুরুষ মানুষ। শুধু তাই নয়, আল্লা ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, নৃশংসতা ইত্যাদি প্রাকৃত গুণের অধিকারী। যদি কোন মানুষ আল্লা ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করে তবে তিনি তার প্রতি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করেন। এইসব মহাপাপীকে তিনি সম্ভব হলে এই পৃথিবীতেই মর্মন্তুদ শাস্তি দেন, অথবা পরকালে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করেন। কাজেই ইসলামের আল্লা খুবই অ-নিরপেক্ষ এবং ভয়ঙ্করভাবে পক্ষপাত দিষে দুষ্ট। শুধু মুসলমানদের প্রতিই তিনি দয়ালু দয়াময় বা রহমানির রহিম। কিন্তু অ-মুসলমানদের কাছে তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ একজন জল্লাদ বা দানব বিশেষ। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এরকম প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত গুণ সম্পন্ন আল্লা কখনও অনাদি ও চিরস্থায়ী হতে পারেন না। সময়ের সাথে তাঁর পরিবর্তন ও ধ্বংস অনিবার্য। অনেক মুসলমান পন্ডিত দাবি করে থাকেন যে, ইসলামের আল্লা সর্বত্র বিদ্যমান ও সর্বদর্শী। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ৬০ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাকৃত দেহধারী আল্লার পক্ষে সর্বত্র বিদ্যমান থাকা কখনোই সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আল্লার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে তাঁর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, বেদান্তের ব্রহ্ম ও ইসলামের আল্লার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান এবং একজন মহামুর্খের পক্ষেই বলা সম্ভব যে, যিনিই বেদান্তের ব্রহ্ম তিনিই কোরানের আল্লা। এবং "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে" প্রবন্ধের লেখকের মত একজন মহামূর্খের পক্ষেই সম্ভব কিছু না জেনে, না বুঝে মন্তব্য করা যে, যিনিই বেদান্তের ব্রহ্ম তিনিই কোরানের আল্লা।

৩

বিগত ১৮৯৭-৯৮ সালে স্বামীজী বেলুড়স্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জন্য কিছু নিয়ম কানুন বাংলায় লিপিবদ্ধ করেন এবং তা "বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। পরে, ১৯৬৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠের

ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার ইংরাজী তর্জমা করা হয় এবং তা "Rules and Regulations of the Ramkrishna Math" (RRRM) নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। যাই হোক, উল্লিখিত বাংলা পুস্তিকার ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী অধ্যায়ে স্বামীজী লেখেন, "মুসলমানগণ যখন এইদেশে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিকদের মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটি হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তিদোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তিদোষ আছে, কারণ, মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক প্রজা ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটিরও অধিক ছিল; কিছুতেই ন্যূন নয়। কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রিস্টানরাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটি লোক খ্রিস্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রিস্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দু জাতি ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

স্বামীজীর লেখা উপরিউক্ত অনুচ্ছেদটির মধ্যে তিনটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ স্বামীজী বলেননি যে, ইসলাম একটি প্রেম ও মৈত্রীর ধর্ম। পরন্তু তিনি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম হল চূড়ান্ত ঘৃণা-বিদ্বেষ ও রক্তপাতের ধর্ম এবং সেই কারণেই মুসলমানদের পক্ষে ৪০ কোটি হিন্দুকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি খৃস্টধর্মেরও প্রশংসা করেননি। উপরন্তু বলেছেন যে, খৃস্টানরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে ভারতে খৃস্টানের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। তৃতীয়তঃ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলেছেন, তা হল, করুণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ "সব ধর্ম সমান" এই তত্ত্ব প্রচার করতে ধরাধামে অবতীর্ণ হননি। তিনি মুসলমান ও খৃস্টানদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম ও হিন্দুদের রক্ষা করতেই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাই তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ অমান্য করে হিন্দুদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছেন। সরকারি অনুদানের লোভে তাঁরা তাঁদের গুরুর নির্দেশকেই পদদলিত করছেন এবং "সর্বধর্ম সমন্বয়"-র এক অলীক ও বিকৃত তত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, আজ যদি স্বামীজী বেঁচে থাকতেন তবে এইসব বিপথগামী সাধুদের তিনি লাথি মেরে বিদায় করতেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে জঞ্জালমুক্ত করতেন।

উপরিউক্ত "বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী" পুস্তিকায় স্বামীজী আরও

লিখেছেন ''কারণ যে কেহ হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটি শত্রু অধিক হয়'' এবং ''মুসলমান ও খ্রিস্টানদিগকেও হিন্দু ধর্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে।'' এটা খুবই সুখের কথা যে, এইসব ধর্মান্তরিত শত্রুদের দ্বারা দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ তাঁকে দেখে যেতে হয়নি। যাই হোক, এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে সব ধর্মত্যাগী মুসলমানকে স্বামীজী হিন্দুর শত্রু বলে চিহ্নিত করে গিয়েছেন, আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সেই মুসলমানদের হিন্দুর বন্ধু বলে প্রচার করে চলেছেন। স্বামীজী নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন যে, যে সব হিন্দু এককালে প্রাণের ভয়ে (কিংবা প্রলোভনে পড়ে) মুসলমান বা খৃস্টান হয়েছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হবে ধর্মান্তরিত সেইসব হিন্দুদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা আজ যা করে চলেছেন তা স্বামীজীর শিক্ষার ঠিক বিপরীত।

প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে অনেক আগেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা বিপথগামী হয়েছেন। স্বাধীনতার ঠিক পরেই, এই দেশে মুসলমান তোষণকারী ভন্ড সেকুলারবাদীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই তাঁরা ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সেকুলারবাদী হয়ে গেয়েছেন। অধিক মাত্রায় সরকারি অর্থ ও অনুদান পাওয়ার লোভে তাঁরা ঠাকুরের যত মত তত পথ এর শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত কৃত বিকৃত ব্যাখ্যার মস্ত প্রচারক হয়েছেন। এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক বিকৃত তত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন। যেই ইসলাম ও খৃস্টধর্মকে তাঁরা প্রেমের ধর্ম ও মুসলমান ও খৃস্টানদের তাঁর বিশ্বপ্রেমিক বলে চালাতে চেষ্টা করছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ বহু আগে তাদের প্রকৃত চরত্রি উদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন। গত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী কালিদাস নাগ মহাশয়কে একখানা পত্রে লিখেছেন, ''এই পৃথিবীতে দুটি ধর্ম আছে, যাদের সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্মের চির বৈরিতা বর্তমান। এই ধর্ম দুটি হল ইসলাম ও খৃস্টধর্ম। এরা শুধু নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, পরন্তু অন্য সমস্ত ধর্মকে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর। তাই এদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের একটাই রাস্তা আছে, আর তা হল তাদের ধর্ম গ্রহণ করা।''

প্রকৃত সত্য হল, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা আজ নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত বোধ করেন। তাঁরা হয়েছেন সব ধর্মকে সম্মানকারী সেকুলারবাদী। তাই তাঁরা বিবেকানন্দের গেরুয়া আলখাল্লাকে কালো রঙ করে তাঁকেও সেকুলার

বানিয়ে দিয়েছেন। স্বামীজীর চিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতারত যে তেজস্বী চিত্রখানা ছিল, যার গায়ে লেখা ছিল .Swami Vivekananda : Hindu Monk of India, সেই চিত্রখানা ছাপা তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, আজকের রামকৃষ্ণ মিশন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, একটি ব্যবসায়িক সংস্থা মাত্র। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে রোজগার হচ্ছে, হাসপাতাল বানিয়ে রোজগার হচ্ছে, বই ছাপিয়ে বিক্রি করে রোজগার হচ্ছে, গেস্টহাউস নামের আড়ালে হোটেল বানিয়ে রোজগার হচ্ছে ইত্যাদি। তাই স্বামীজীর আদর্শের আর কি প্রয়োজন? হিন্দু সমাজের কথা চিন্তা করারই বা কি প্রয়োজন? হিন্দু গোল্লায় যাক, আমার ব্যবসা চলুক। এই সমস্ত কারণে শ্রীপবিত্র ঘোষ মহাশয় তাঁর একটি নিবন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনকে ব্যঙ্গ করে "রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভান্ডার" আখ্যা দিয়েছেন।

তবে কিছু কিছু আদর্শবাদী সন্ন্যাসী এখনও আছেন, কিন্তু কলকে পাচ্ছেন না। আদর্শবাদের কথা বললেই আশ্রম থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা অনেকে আবার নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছেন ইত্যাদি. একজন আদর্শবাদী সন্ন্যাসী পুনরায় বিবেকানন্দের আদর্শে ফিরে যাবার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান এবং Back to Vivekanda নামে একখানা পুস্তক লেখেন। ফলে কায়েমী স্বার্থের অনুসরণকারী সাধুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সাধুর নেতৃত্বে ওই পুস্তকের সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" প্রবন্ধের লেখক লিখেছেন, "প্রত্যেকে দাবি করিয়া থাকে যে, তাহার ধর্ম অনাদি ঈশ্বর হইতে আগত। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বিভিন্ন ধর্ম কেন পরস্পর বিরোধী হইবে? ধর্মের মূল বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব যে, কোন ধর্মই কাহারো বিরোধী নহে। যুগের প্রয়োজন অনুসারে, এক দেশে একজন মহাপুরুষ যাহা বলিতেছেন, অন্য পরিবেশে অপর একজন মহাপুরুষ বাহ্যত অন্য কিছু বলিতেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে বা ধর্মের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে যে, মূলগতভাবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।" কিন্তু ইসলামের কোন গ্রন্থ পড়ে তিনি ইসলামের মূলে প্রবেশ করতে পেরেছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। কোন সেই মহান গ্রন্থ থেকে তিনি খোঁজ পেয়েছেন যে

হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম মূলে একই তা তিনি গোপন রাখলেন কেন? আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রামকৃষ্ণ মিশনের সেই নির্বোধ সাধু ছাড়া দুনিয়ার আর কোন লোক সেই মহান গ্রন্থের সন্ধান পেল না। তাই তাদের পক্ষে ইসলামের মূলে প্রবেশ করাও সম্ভব হল না। সকলেই স্বীকার করবেন যে, সেই সাধুর উচিত ছিল সেই গ্রন্থের নাম প্রকাশ করে দেওয়া, যাতে সকলেই সেই গ্রন্থ পাঠ করতে পারে এবং ইসলামের মূলে প্রবেশ করতে পারে। কি করে সংসার ত্যাগী এক সন্ন্যাসী এই সমস্ত ডাহা মিথ্যা কথা লিখতে পারে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। হিন্দু বা সনাতন, বা বৈদিক ধর্মের সঙ্গে ইসলামের একটি তুলনামূলক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আমি দুটি বিষয়ের ব্যাপারে এই দুটি ধর্ম কি বলে সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। প্রথম বিষয়টি হল এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হল মানুষের অন্তিম গতি হিসাবে এই দুটি ধর্ম কি বলছে।

৪

শুরুতেই একটা বিষয় বলে রাখা উচিত এবং তা হল, অতি আদিম কালে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়ে ছিল। তখন মানুষ বনে বনে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করত এবং তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। পরে সে যখন পশুকে পোষ মানাতে শিখল, তখন থেকে শুরু হল যাযাবর পশুপালকের পর্যায়। সেই সময় পর্যন্ত মানুষের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যতদিন পশুর খাবার ঘাস পাওয়া যেত, ততদিন তারা এক জায়গায় থাকত এবং ঘাস ফুরিয়ে গেল স্থানান্তরে চলে যেত। এই যাযাবর জীবন শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পক্ষে সহায়ক ছিল না। মনুষ্য সভ্যতার শুরু হল সেই দিন, যে দিন মানুষ কৃষিকাজ ও কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা শুরু করল। কৃষির জমি মানুষকে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসতি করতে বাধ্য করল, বা মানুষের একটা স্থায়ী ঠিকানা হল। এই স্থায়ী ঠিকানাই কালে আধুনিক রাষ্ট্র, বিচার ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার জন্ম দিল। কৃষিকাজ অনেক লোকের অন্ন বস্ত্রের যোগান দিতে সমর্থ হবার ফলে সমাজের কিছু লোক জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে সময় দিতে সক্ষম হল। ফলে গড়ে উঠল আধুনিক মানব সভ্যতা। কাজেই বলা চলে যে, কৃষিই হল মানব সভ্যতার সূতিকাগার।

আজ এটা সবর্জন বিদিত যে, ঋগ্বেদ হল মনুষ্য রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ। পন্ডিতেরা এ ব্যাপারেও এক মত যে, ঋগ্বেদের যুগের অনেক আগেই ভারতীয় সমাজ পশুপালকের স্তর অতিক্রম করে কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরি হয়েছিল। কিন্তু যেই আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল সেখানে মরুময় জমি ও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য কৃষি কাজ এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই আরব্য সমাজ আজও পশুপালকের স্তরেই পড়ে আছে, কৃষিভিত্তিক সমাজে উন্নীত হতে পারেনি। আরব্য সমাজ আজও যাযাবর পশুপালকের সমাজ। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, হিন্দু ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সুসভ্য সমাজে এবং ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে আরবের অসভ্য পশুপালক সমাজে। কাজেই ইসলাম হিন্দু ধর্ম থেকে নিকৃষ্ট হতে বাধ্য। হিন্দু ধর্মের দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি যা কিছু আছে, তার রচনাকারীরা ছিলেন অতিশয় শিক্ষিত ও অত্যন্ত মানবিক ও আধ্যাত্মিক সব ব্যক্তিগণ, যাদের বলা হয় ঋষি। কিন্তু ইসলামের প্রবর্তকরা ছিলেন অশিক্ষিত ও নিরক্ষর আরবের পশুপালক।

আরবের পশুপালকদের জীবন নির্বাহ করতে হয় খেজুড় ও মাংস খেয়ে। তাই তাদের সমাজে পশু হত্যা করা আমাদের বাজার হাট করার মত একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। এই কারণে আরবের লোকদের মধ্যে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা সহজাত ব্যাপার। এই নিষ্ঠুর নৃশংস সমাজে ইসলামের জন্ম হবার ফলে ইসলামের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা। আরব্য সমাজ যে আজও পশুপালকের স্তরে পড়ে রয়েছে, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের পক্ষে সৌর বছর গণনা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, কারণ সূর্যের বার্ষিক আবর্তনের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তন হয় যার সঙ্গে কৃষি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু আরবের সমাজ আজও পশুপালক স্তরে পড়ে আছে বলে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চান্দ্র হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে চালিয়ে যেতে পারছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, হিন্দু ধর্ম উন্নত কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্ভুত হবার ফলে তা ইসলামের থেকে অনেক উন্নত।

হিন্দু ধর্মের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি হল এই দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল বিশ্ব জগতের মূলে রয়েছে একটি অপরিবর্তনশীল ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্ত্বা, যাঁর নাম ব্রহ্ম। সংস্কৃত বৃহৎ শব্দ থেকে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। যার থেকে বৃহৎ আর কিছু নেই তিনিই ব্রহ্ম। এই জগতে দৃশ্য অদৃশ্য, জড় প্রাণী, যা কিছু আছে তা সবই ব্রহ্ম

থেকে উৎপন্ন। অপরদিকে, ব্রহ্ম হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার অতীত। ব্রহ্ম হলেন—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈর্দেবৈঃ। অর্থাৎ, ব্রহ্মকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাকে জানা যায় না।

সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দু শাস্ত্র বলছে, ৪৩,২০,০০০ বছরে এক মহাযুগ হয় এবং ১০০০ মহাযুগ বা ৪৩২ কোটি বছরে হয় ১ কল্প। ১ কল্প সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দিন এবং পরবর্তী ১ কল্প ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মার দিনকে বলে সৃষ্টি বা সর্গ এবং ব্রহ্মার রাত্রিকে বলে প্রলয় বা প্রতিসর্গ। ব্রহ্মার দিনে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিশ্ব জগতে রূপান্তরিত হন এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রহ্ম আবার ইন্দ্রিগ্রাহ্যতার অতীত অবস্থায় ফিরে যান। কাজেই হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ৪৩২ কোটি বছর পর পর সৃষ্টি ও প্রলয় হয়ে চলেছে। তাই শ্রীমদ্ভাবদ্গীতা বলছে,

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।। (৮ : ১৭)
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।। (৮ : ১৮)
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্রাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।। (৮ : ১৯)

অর্থাৎ এক সহস্র (মহা) যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং এক সহস্র (মহা) যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। যিনি ইহা জানেন তিনিই দিবা রাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন (৮ : ১৭)। সমগ্র ভূতসমুদয় ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁর রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তেই লয় হয় (৮ : ১৮)। হে পার্থ! প্রকৃতির বশবর্তী সেই ভূতসমুদয় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয় (৮ : ১৯)।

এই গণনার ভিত্তি হল, প্রতি ১ মহাযুগ বা ৪৩,২০,০০০ বছর পর পর আকাশের সমস্ত গ্রহ এক সরল রেখায় মেষ রাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্রে (β and γ Arietis) মিলিত হয়। সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ ও স্মৃতি গ্রন্থে এই কথা লেখা আছে।

(এ ব্যাপারে আরও বিশদ বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের হিন্দু কালগণনা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান প্রসঙ্গে এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হল এটা বোঝানো যে, হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব কোন অযৌক্তিক ছেলে ভুলানো গল্প নয়। হিন্দু ধর্ম বলে না যে, কোন এক সকালে ভগবানের মনে ইচ্ছা হল তিনি জগৎ সৃষ্টি করবেন এবং সেই অনুসারে কোন কাঁচামাল ছাড়াই শূন্য থেকে এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে ফেললেন। এ ব্যাপারে খ্রীস্ট মত বলছে যে, ৪০০৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের ২৩শে অক্টোবর সকাল ৯টায় গড তাঁর সৃষ্টি কার্য শুরু করেন এবং ছয় দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিন রবিবার তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেই রকম ইসলাম বলছে যে কোন এক শনিবার আল্লা তাঁর সৃষ্টি কার্য শুরু করেন এবং ছয় দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী, আকাশ ও আকাশের ওপরে সাত স্বর্গ সৃষ্টি করেন। সপ্তম দিন শুক্রবার তিনি প্রথম মানব ও মানবী আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করেন এবং আরবের নবী মহম্মদ ছিলেন আদমের ৯০তম বংশধর। কাজেই দুই পুরুষের মধ্যে ৩০ বছরের ব্যবধান ধরে নিলে বলতে হয় যে, আল্লা তাঁর সৃষ্টিকার্য শুরু করার ২৭০০ বছর পর মহম্মদের জন্ম হয়। নবী মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, তাই হিসাব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ৪১৩৭ বছর আগে আল্লা পৃথিবী, আকাশ ও সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করেছিলেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম বা খ্রীস্টমতের প্রবক্তাদের এই বিশ্ব (Universe) ও তার বিশালতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। তাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে। তাই তাঁদের গড বা আল্লার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে গড এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আজ থেকে ৬০১৩ বছর আগে এবং আল্লা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আজ থেকে ৪১৩৯ বছর আগে। আগেই বলা হয়েছে যে, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ৪৩২ কোটি বছরে ১ কল্প হয়। তেমনি ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮ হাজার বছরে হয় ১ মন্বন্তর। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বর্তমানে শ্বেতবরাহ কল্প চলছে এবং শ্বেতবরাহ কল্প শুরু হবার পর থেকে ৬টা মন্বন্তর পার হয়ে বর্তমানে ৭ম মন্বন্তর বৈবস্বত চলছে। সব হিসাব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার ১০৯ বছর আগে বর্তমান কল্প বা সৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) হয়েছিল। কাজেই বলা চলে যে, হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞান খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। খ্রীস্টমত ও ইসলাম অনুসারে সৃষ্টির আগে আল্লা বা গডের কোন কাজ ছিল না। ৫০০০ কি ৬০০০ বছর আগে আল্লা বা গড সক্রিয় হয়ে এই আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন তিনি তাঁর এই সৃষ্টিকে নিজে হাতে ভেঙে ফেলবেন। মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ অনন্ত স্বর্গে আবার কেউ কেউ অনন্ত নরকে চলে যাবে। কাজেই গড বা আল্লার কাজও ফুরিয়ে যাবে। আল্লা বা গড আবার নিষ্কর্মা হয়ে পড়বেন। তরোয়াল দিয়ে প্রাণের ভয় না দেখালে কোন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী মানুষ এইসব ছেলে ভুলানো গালগল্পে বিশ্বাস করতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হিন্দু কাল গণনা চক্রাকার এবং খ্রীস্ট বা ইসলামী মতের মত রৈখিক নয়। তাই হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি এবং প্রলয় চক্রাকার পথে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে। কোনদিন শেষ হবে না।

ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের মত সেমিটিক ধর্মগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের আরও একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের ভগবান অনেকটাই মানুষের মত। তাঁরা অনেক দূরে, স্বর্গে বাস করেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা পার্থিব ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইসলামী মতানুসারে আল্লার উচ্চতা ৬০ হাত এবং তাঁর মুখমন্ডল মানুষের মত। এছাড়া তাঁর রয়েছে ক্রোধ, হিংসা, লোভ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি মানুষের মত গুণাবলী। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এ রকম প্রাকৃত গুণ সম্পন্ন আল্লা বিনাশশীল হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে হিন্দুর ঈশ্বর নিরাকার ও নির্‌গুণ। তাঁর মাত্র একটি গুণ আছে আর তা হল তিনি চৈতন্যময়। হিন্দুর এই নিরাকার ও চৈতন্যময় ঈশ্বরের নাম ব্রহ্ম বা আত্মা। আগেই বলা হয়েছে যে, এই ব্রহ্ম বা আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত এবং তিনি সর্বব্যাপী। ব্রহ্ম হলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সৃষ্টিকালে এই ব্রহ্ম থেকেই এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগৎ উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত ব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্ম তাঁর চৈতন্য শক্তির দ্বারা সমস্ত পার্থিব ঘটনাবলী ভিতর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। তাই মুন্ডকোপনিষদে বলা হচ্ছে—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।। (২ : ১ : ৩)

অর্থাৎ, এই (এক ব্রহ্ম) হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

হিন্দু ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পুনর্জন্মের অবধারণা। এই অবধারণার মূল ভিত্তি হল, মানুষের জৈবিক দেহ বিনাশশীল কিন্তু তার আত্মা অবিনাশী। কাজেই যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন তার দেহের বিনাশ, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা তখন একটা নতুন দেহকে আশ্রয় করে। কাজেই প্রত্যেক বার মৃত্যুর পর মানুষ নতুন দেহে জীবন শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়া প্রকৃতির নিয়মের বশেই চলতে থাকে। নতুন জন্ম আগের জন্মের থেকে ভাল হবে না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে পূর্ব জন্মের কর্মের ওপর। আগের জন্মে ভাল কাজ করলে পরের জন্ম ভাল হবে এবং আগের জন্মে খারাপ কাজ করলে পরের জন্ম মন্দ হরে। তাই গীতায় বলা হচ্ছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শীররে।। (২ : ২০)

অর্থাৎ, এই আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেনও না, এবং আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তিসাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং শাশ্বত, শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। (২ : ২২)

অর্থাৎ, মানুষ যেমন পুরাণো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনই পুরানো শরীরকে পরিত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।

এই পার্থিব জীবনের কর্তব্য হিসাবে হিন্দু ধর্ম প্রত্যেক মানুষের সামনে চারটি লক্ষ্য রেখেছে। এদের বলা হয় পুরুষার্থ। এই চারটি পুরুষার্থ হল, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এদের মধ্যে অর্থ ও কাম হল বৈষয়িক এবং ধর্ম ও মোক্ষ হল আধ্যাত্মিক। এই চার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই হল শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিটি হিন্দুর অন্তিম কামনা হল মোক্ষ লাভ করা। বা বলা যায় যে, প্রতিটি হিন্দুর অন্তিম গতি হল মোক্ষ। মোক্ষ শব্দের অর্থ হল মুক্তি। বিশেষ অর্থে জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি। যখন মানুষের মনে এই উপলব্ধি হয় যে, এই বিশ্ব জগতে একমাত্র ব্রহ্মই আছে এবং আমরা যা দেখছি, যা শুনছি তা সবই এক ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এবং সেই হিসাবে সে নিজেও ব্রহ্ম, তখন তাঁকে বলে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মবিদ।

মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে কি হয়? মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে সে জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পায়। মানুষ ভোগের মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করতে পারে

না, ত্যাগের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিরন্তর সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। হিন্দুধর্ম এর থেকেও অনেক বড় কথা বলে। হিন্দু ধর্ম বলে—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানী নিজে ব্রহ্মই হয়ে যান। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি এবং মুনের্বিজানিতাত্মা ভবতি গৌতম-অর্থাৎ, হে গৌতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মেশালে যেমন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানীও ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যান। অর্থাৎ, কোন সাধক ব্রহ্মজ্ঞানী হলে তিনি নিজেই ব্রহ্ম বা ভগবান হয়ে যান।

এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বা একমাত্র হিন্দু ধর্মই বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থিত করতে পেরেছে। একমাত্র হিন্দুধর্মই মানুষকে প্রথমে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং সেই মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করার কথা শুনিয়েছে। পৃথিবীর আর কোন ধর্ম মানুষকে এই কথা শোনাতে পারেনি। কাজেই একজন হিন্দুর কাছে শ্রেষ্ঠ বা চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিজেকে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করা এবং মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করা।

৫

একজন মুসলমানের কাছে চমর আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল আল্লার স্বর্গ বা জান্নাতে প্রবেশ করা এবং অনন্তকাল সেখানে বসবাস করা। অবশ্য এজন্য তার কোন ত্যাগ, তিতিক্ষা বা সাধনার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু কলমা পড়ে মহম্মদের সত্য ধর্ম গ্রহণ করা এবং আল্লার কোরান ও মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলাম ধর্মে ৬টা শপথ বাক্য বা কলেমা আছে, যার মধ্যে প্রথম কলেমার নাম হল কলেমা তৈয়ব। এই কলেমা তৈয়ব বলছে—লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা বা আল্লা ছাড়া উপাস্য নেই এবং মহম্মদ আল্লার রসুল (বা পয়গম্বর)। ইসলামে এই কলেমা তৈয়বের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু এই কলেমায় বিশ্বাস করার জন্যই সব মুসলমান আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করবে। একদিন আল্লা সমস্ত মানুষের শেষ বিচার বা কিয়ামৎ-এর অনুষ্ঠান করবেন। ভয়ঙ্কর সেই কিয়ামতের দিন আল্লা সবাইকে করব থেকে উত্থিত করে বিশাল হাসরের ময়দানে সমবেত করবেন। আল্লা সবাইকে নগ্ন ও ছুন্নৎ বিহীন (Uncircumcised) ভাবে

উত্থিত করবেন (সহিহ মুসলীম-৬৮ ৪৪, ৬৮৪৬, ৬৮৪৭)

আল্লার বিচারের পদ্ধতি খুবই অদ্ভুত। এই পৃথিবীতে জীবিতকালে কে ভাল কাজ করেছে আর কে খারাপ কাজ করেছে, আল্লা সে বিচার করবেন না। আল্লা প্রথমেই দেখবেন যে, তাদের মধ্যে কে মুসলমান নয়। যারা মুসলমান এবং কলেমা তৈয়বে বিশ্বাস করেছে, আল্লা তাদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও পাহাড় প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তাদের ওপর তার অসীম দয়া (রহমৎ) বর্ষণ করবেন এবং তাদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন। আর যারা মুসলমান নয়, কাফের, তাদের সবাইকে তিনি নরকের আগুনে ঠেলবেন। সেই কাফেরদের মধ্যে যদি অতিশয় পুন্যাত্মা ব্যক্তিও থাকেন, তারাও আল্লার রহমৎ পাবে না। মুসলমান না হবার অপরাধের জন্য তাদেরও আল্লা নরকের আগুনে ফেলে দগ্ধ করবেন। প্রত্যেক বার দগ্ধ করার পর তিনি নতুন চামড়ার সৃষ্টি করে দেবেন এবং আবার দগ্ধ করবেন (কোরান-৪/৫৬)। একদিন নবীর স্ত্রী আয়েশা নবীকে প্রশ্ন করলেন, "আল্লার আসুল, নারী পুরুষ সবাইকে কি নগ্ন অবস্থায় উত্থিত করা হবে?" নবী মহম্মদ বললেন, "হ্যাঁ। তখন আয়েশা বললেন, "তখন যদি একে অন্যের দিকে তাকায়!" এই বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে মহম্মদ বেশ বিরক্ত হলেন এবং বললেন, "সে দিন পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর থাকবে যে, একে অন্যের দিকে তাকাবার কথা মনে হবে না।" (সহিহ মুসলীম-৬৮৪৪)। ভয়ঙ্কর সেই কিয়ামতের দিন আল্লা সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন তাকে পৃথিবীর খুব কাছে নিয়ে আসবেন। এত কাছে নিয়ে আসবেন যে, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় ১ মাইল। (সহিহ্ মুসলীম-৬৮৫২)

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লার অদ্ভুত বিচারের ফলে সব মুসলমান্, অত্যন্ত পাপাচারী ও পতিত মুসলমানও আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে। অপর দিকে সমস্ত অ-মুসলমান কাফেরের স্থান হবে নরকে। আল্লার দৃষ্টিতে সমস্ত কাফেরের মধ্যে হিন্দুরা হল সর্বাপেক্ষা হীন। কারণ তারা মূর্তি পূজা করে। এইভাবে মূর্তি পূজা করে তারা আল্লার শরীক খাড়া করছে বা শির্ক পাপ করছে। তাই তারা হল ঘৃণ্য মুশরিক। এই কারণে আল্লা হিন্দুদের সব থেকে যন্ত্রণাময় নরক হাভিয়াতে পাঠাবেন। আল্লা সর্বজ্ঞানী, তাই তিনি নানান রকম কাফেরদের জন্য ৭ রকমের নরক তৈরি করে রেখেছেন। কোন নরকে আগুন পায়ের পাতা পর্যন্ত, কোন নরকে তা গোড়ালি পর্যন্ত, কোন নরকে হাঁটু পর্যন্ত, কোন নরকে কোমর পর্যন্ত। কিন্তু

হাভিয়া নরকে আগুন হবে মাথার তালু পর্যন্ত এবং সেই আগুন পৃথিবীর আগুনের চাইতে ৭০ গুণ বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবে। এই ব্যাপারে কোরান বলছে, "তোমরা এবং আল্লার বদলে তোমরা যাদের উপাসনা কর, সেগুলো তো নরকের ইন্ধন; তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে" (২১ : ৯৮)। কিন্তু খ্রীস্টান ও ইহুদীরা মূর্তিপূজা করে না বলে তারা কম যন্ত্রণাদায়ক নরকে স্থান পারে।

অপরদিকে সর্বজ্ঞানী আল্লা মুসলমানদের জন্য ৮ রকমের জান্নাত বা স্বর্গ তৈরি করে রেখেছেন। এরা হল (১) খেল্‌দ, (২) দার-এস-সালাম, (৩) দারুল, (৪) আদান, (৫) নঈম, (৬) মারোয়া, (৭) আলুইন ও (৮) ফেরদৌস। এদের মধ্যে খেল্‌দ হল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং ফেরদৌস হল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ। এই সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ ফেরদৌস শুধু নবীদের জন্য, গাজীদের জন্য আর জিহাদে নিহত শহীদদের জন্য সুরক্ষিত রাখা আছে। যে মুসলমান জীবনে কমপক্ষে একটা কাফের হত্যা করেছে, তারাই হল গাজী। এইসব ব্যাপারে কোরান বলছে, "আমি তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সব রকম পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেব" (৪।৩১)। "আল্লা তাঁর শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যারা আল্লার শরিক (খাড়া) করে তারা মহাপাপ করে" (৪।৪৮)। "তাঁরা (আল্লার) পরিবর্তে যারা অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, তারা হল পথভ্রষ্ট" (৪।১১৬)। "আল্লা বিশ্বাসীদের সমস্ত দুষ্কর্ম মাফ করে দেবেন" (৩৯।৩৫)।

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লা বিশ্বাসীদের জন্য ৮ রকমের স্বর্গ তৈরি করে রেখেছেন এবং পদমর্যাদা হিসাবে বিভিন্ন মুসলমান বিভিন্ন জান্নাতে স্থান পাবে। তাই **"মানুষ মাথা উঁচু করে যেমন আকাশের চাঁদ দেখে, সেইরকম নিচস্থ স্বর্গের সাধারণ মানুষ মাথা উঁচু করে উচ্চস্থ স্বর্গের মানুষদের দেখবে"** (সহীহ মুসলীম - ৬৭৮৮, ৬৭৮৯)। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লার পথ বেছে নেয়নি, তারা সবাই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লার নরকের আগুন হবে পার্থিব আগুনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। **"সেই আগুনের তীব্রতা হবে পার্থিব আগুনের ৭০ গুণ"** (সাহীহ মুসলীম-৬৮১১)। সর্বজ্ঞ আল্লা বিভিন্ন রকম কাফেরদের জন্য ৭ রকমের নরক তৈরি করে রেখেছেন। আল্লা কাফেরদের অনন্তকাল ধরে নরকের আগুনে দগ্ধ করবেন। কিন্তু একবার নগ্ধ করার পর চামড়া পুড়ে গেলে পরের বার দগ্ধ করার সময় তাদের জ্বালা যন্ত্রণা তত বেশি হবে না। তাই সর্বজ্ঞ আল্লা

"প্রত্যেক বার দগ্ধ করার পর আবার নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেবেন, যাতে তারা অনন্তকাল ধরে চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে" (কোরান-৪।৫৬) **"আল্লার স্বর্গে এবং আল্লার নরকে কারও কোনদিন মৃত্যু হবে না"** (সাহীহ মুসলীম - ৬৮২৭, ৬৮২৯)। **"এই ঘোষণা শুনে স্বর্গবাসীদের মনে আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে, কিন্তু নরকবাসী কাফেরদের মনে দুঃখ বাড়বে"** (সহীহ মুসলীম-৬৮৩০)।

তাছাড়া আল্লার নরকে (দোজখে) কাফেররা বিচিত্র রকমের আকার ধারণ করবে। যেমন, **"তাদের দাঁতগুলো হবে উহুদ পাহাড়ের মত এবং তাদের গায়ের চামড়া এত মোটা হবে যে তা পার হতে একজন অশ্বারোহীর তিন রাত্রি সময় লাগবে"** (সহীহ্ মুসলিম - ৬৮৩১)। সেইসঙ্গে **"তাদের দুই কাঁধের মধ্যেকার দূরত্ব পার হতেও একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন রাত্রি সময় লাগবে"** (সাহীহ্ মুসলীম - ৬৮৩২)। মহম্মদ তাঁর স্বর্গ ভ্রমণ বা মেরাজ-এর সময় দেখেছেন যে, **"বনি কাব-এর ভাই আমর বিন লুহায়ার পেট থেকে সব নাড়ি ভুরি বেড়িয়ে গেছে এবং সে সেগুলো টানতে টানতে নরকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে. সে আরবে মূর্তিপূজা চালু করেছিল, তাই তার এই শাস্তি"** (সহীহ্ মুসলীম - ৬৮৩৮)।

যখন কাফেররা নরকের আগুনে জ্বলে পুড়ে চরম যন্ত্রণা ভোগ করবে, তখন মুসলমানরা মহোল্লাসে স্বর্গে প্রবেশ করে মহা আনন্দ ফূর্তিতে রত থাকবে। **"আল্লা তাদের সমস্ত রকমের দুষ্কর্ম মাফ করে দেবেন"** (৩৯।৩৫)। আল্লার জান্নাতে রয়েছে বিশুদ্ধ দুধের নদী, বিশুদ্ধ মধুর নদী এবং বিশুদ্ধ সুরার নদী। মুসলমানরা যখন ইচ্ছা, যত ইচ্ছা তা পান করবে। মুহাজির (যারা মক্কা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মদিনায় এসেছিল) ও আনসারদের (মদিনার যেই সব মুসলমান মুহাজিরদের সাহায্য করেছিল) মধ্যে যারা সঠিক পথ দেখিয়াছিল এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লা তাদের প্রতি প্রসন্ন। **"তাদের জন্য তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, যার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। তারা সেইখানে অনন্তকাল ধরে বাস করবে। এটাই মহান সাফল্য"** (৯।১০০)। **"তিনি তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচে বয়ে যাচ্ছে নদী। জান্নাতের মনোরম উদ্যানে, সুরম্য অট্টালিকায় তোমরা বাস করবে। এটাই মহান সাফল্য"** (৬১।১২)। **"এই হল জান্নাত যা বিশ্বাসীদের**

জন্য তৈরি করা হয়েছে। যার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে বিশুদ্ধ জলের নদী, বিশুদ্ধ দুধের নদী, স্বর্গীয় সুরার নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী। তারা সেখানে খাবে সুস্বাদু স্বর্গীয় ফলমূল আর পাবে আল্লার ক্ষমা" (৪৭।১৫)।

নবী মহম্মদের এক বিশ্বস্ত অনুচরের নাম ছিল আবু হোরাইরা। সেই আবু হোরাইয়া বর্ণিত একটি হাদিস বলছে যে, মহান আল্লা বলেছেন, "আমি আমার সৎ কর্মশীল বান্দাদের জন্য যা (জান্নাত) তৈরি করে রেখেছি তা আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি বা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু কোরান তার সাক্ষী আছে। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি যে কি ভোগ সুখের ব্যবস্থা আমার বান্দাদের জন্য তৈরি করে গোপন করে রেখেছি, আমার বান্দারা যা তাদের সুকর্মের পুরস্কার স্বরূপ পাবে" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৭৭৯, ৬৭৮০, ৬৭৮১, ৬৭৮২, ৬৭৮৩)।

আল্লার জান্নাতে একটা রাস্তা আছে যেখানে স্বর্গবাসীরা প্রতি শুক্রবার বেড়াতে যাবে। তখন "উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস বইবে। সেই বাতাসের সুগন্ধ স্বর্গবাসীদের শরীর ও জামাকাপড় সুগন্ধিত করবে এবং তাদের সৌন্দর্য ও চেরাহার শ্রী বৃদ্ধি করবে" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৭৯২)। "জান্নাতে এক বিশাল গাছ থাকবে যার ছায়া অতিক্রম করতে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর ৩০০ বছর সময় লাগবে" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৭৮৪, ৬৭৮৫, ৬৭৮৬ ও ৬৭৮৭)। "জান্নাতে এক বিশাল তাবু থাকবে যা একটা মুক্তাকে খোদাই করে বানানো হয়েছে এবং তার বিস্তার হবে ৬০ মাইল" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৮০৪)। "সেই তাবুর দৈর্ঘ ও প্রস্থ নবে ৬০ মাইল" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৮০৫)। "সেই তাবুর উচ্চতাও হবে ৬০ মাইল এবং তাবুর প্রতিটি কোণে একটি করে পরিবার বসবাস করবে অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাবে না" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৮০৬)। "আল্লার জান্নাতে সাইবান ও জাইবান নামে দুটো নদী থাকবে। স্বর্গের অন্যান্য নদীর মধ্যে স্বর্গবাসীরা এই দুটো নদীকে ইউফ্রেটিস ও নীলনদের মত দেখতে পাবে" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৮০৭)

মুসলমানরা আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে খেতে দেওয়া হবে মাছের ভাজা কোলজে। সেই কোলজে এত বিশাল হবে যে একটা কোলজে ৫০ হাজার লোক খেতে পারবে। এই কোলজে ভাজা খাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শারীরিক গঠন ও দেহের কাজ কর্ম ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক স্বর্গবাসীর

উচ্চতা হয়ে যাবে ৬০ হাত এবং তারা যা খাবে তা সব হজম হয়ে যাবে। তাই তাদের আর মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। সর্দি কাশি ইত্যাদি কোন রোগব্যাধিও তাদের হবে না। তারা সব সময় উৎকৃষ্ট রেশমের পোষাক ও সোনার অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে সোনার পালঙ্কে বিশ্রাম করবে আর নানারকম ভোগ বিলাসে রত থাকবে। তাদের ব্যবহার্য আসবাবপত্র এমনকি দাঁত খোচাবার কাঠিখানাও সোনা দিয়ে তৈরি হবে। তারা অতি উপাদেয় নানারকম জান্নাতি খাবার খাবে। তাছাড়া দুধের নদী থেকে দুধ, মধুর নদী থেকে মধু ও সুরার নদী থেকে উৎকৃষ্ট সুরা পান করবে। আগেই বলা হয়েছে যে তারা যা খাবে তা সবই হজম হয়ে যাবে, তাই মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। শুধু পুরুষ মুসলমানরাই আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলমান রমণীরা সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। তারা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। স্বর্গবাসী মুসলমান পুরুষদের কারও বয়স ৩২ বছরে বেশি হবে না। বয়স বাড়তে বাড়তে যেই ৩২ বছরে পৌঁছাবে, তখন বয়স বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে।

মুসলমানরা জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীর ও চেহারার অদ্ভুত রকম পরিবর্তন হবে। এ ব্যাপারে সহীহ্ মুআসলীমের একটি হাদিস বলছে, "**যে সব মুসলমানরা প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং যারা দ্বিতীয় দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমন্ডল হবে আকাশের নক্ষত্রের মত চমকদার**" (৬৭৯৩)। শুধু বাইরের চেহারাই নয়, তাদের শরীরের ক্রিয়াকর্মও হবে অদ্ভুৎ। "**তাদের মুখে থুথুর উৎপত্তি হবে না এবং তারা সর্দি বা কাশিতে ভুগবে না। তারা যা খাবে তা ১০০ শতাংশ হজম হয়ে যাবে, তাই মলত্যাগ বা প্রস্রাবের দরকার হবে না। তাদের ব্যবহার্য সব কিছু হবে সোনা কিংবা রুপো দিয়ে তৈরি। এমন কি তাদের চিরুণীখানাও হবে সোনা দিয়ে তৈরি। তাদের শরীরের ঘাম থেকে মৃগনাভীর গন্ধ ছড়াবে এবং তাদের দুজন করে পত্নী থাকবে আর তারা এত সুন্দরী হবে যে শরীরের মধ্য দিয়ে হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের হৃদয়ে কোন রকম বিবাদ ও শত্রুতা থাকবে না**" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৭৯৭, ৬৭৯৮, ৬৮০০)। "**জান্নাতবাসীরা কখনো মলমূত্র ত্যাগ করবে না, তারা কোন রকম ব্যাধি বা সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হবে না। তারা থুতুও ফেলবে না। তাদের চিরুণীখানাও হবে সোনার এবং তাদের গায়ের ঘাম হবে মৃগনাভীর সুগন্ধে ভরপুর। তাদের**

পত্নীরা হবে সুনয়না কুমারী এবং সেখানে সবাই আদি পিতা আদমের ৬০ হাত আকৃতি পাবে" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৭৯৫, ৬৭৯৬)।

স্বর্গীয় রমণী হুরীদের কথা ঃ

আল্লার জান্নাতে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু হল স্বর্গীয় রমণী বা হুরীগণ। এই হুরীরা হবে চির কুমারী। জান্নাতবাসী মুসলমানরা হুরীদের সঙ্গে যতবারই মিলিত হোক না কেন, প্রত্যেকবার মিলনের পর তারা তাদের কুমারী দেখতে পাবে। এই হুরীদের সকলের বয়স হবে ১৬ বছর এবং তারা যে পোশাক আশাক পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে। তারা হবে হরিণ নয়না এবং তাদের চোখ হবে ঘন কালো। তারা হবে সুউচ্চ বক্ষ বিশিষ্ট যৌবনে ভরপুর। তারা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কোন পুরুষের দিকে ভুলেও তাকাবে না। তারা হবে অতীব সুন্দরী। এর আগে কোন মানুষ বা জ্বিন তাদের স্পর্শ করেনি। তাদের গায়ের রঙ হবে উটপাখির ডিমের মত। এই হুরীদের কেউ যদি পৃথিবীতে থুথু ফেলতো তবে সারা পৃথিবী মৃগনাভীর গন্ধে ভরপুর হয়ে যেত।

তাই আল্লা কোরানে বলছেন, "**সেখানে থাকবে সুশোভিত উদ্যান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ। আর থাকবে সুউন্নত স্তন বিশিষ্ট ও যৌবনে পরিপূর্ণ স্বর্গীয় রমণীগণ**" (৭৮।৩১)। "**আমি তাদের (স্বর্গবাসীদের) ফলমূল ও মাংসের বিভিন্ন খাবার দেব, যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে আন্যকে পানপাত্র দেবে, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না, এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে মুক্তা সদৃশ কিশোরীরা। আর খাবে সুন্দর পাত্রে করে স্বর্গীয় সুরা। সেই সুরা যে যত ইচ্ছা খাবে, কিন্তু তাতে কোন মাথার যন্ত্রণা হবে না। আর থাকবে হরিণ নয়না সুন্দরীগণ**" (৫২।২২-২৪)। "সুখময় স্বর্গোদ্যানে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে, তাদের ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে পরিবেশন করা হবে, যা পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু; ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা মাতালও হবে না। আর থাকবে সু-আয়তলোচন আনত নয়ন তন্বিগণ, যারা সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌর বর্ণ" (৩৭।৪৩-৪৯)।

"নিশ্চয় সংযমীদের জন্য আছে সফলতা। আছে উদ্যান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং সমবয়স্কা নব যুবতীবৃন্দ, এবং পরিপূর্ণ পান-পাত্রসমূহ" (৭৮।৩১-৩৪)। "সেখানে ওরা রেশমের আস্তর বিশিষ্ট পুরু ফরাসে হেলান দিয়ে বসবে,

তাদের নিকট দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে। সেখানে আয়তনয়না তরুণীগণ থাকবে, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। এইসব তরুণীরা হবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ' (৫৫।৫৪-৫৮)। "সেখানে পরমাসুন্দরী রমণীগণ থাকবে। এই সুলোচনা সুন্দরীগণ তাবুতে অবস্থানকারী। এদের মানুষ বা জ্বিন আগে স্পর্শ করেনি" (৫৫।৭০-৭৪)। "সংযমীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, প্রস্রবণবহুল জান্নাতে। ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি বসবে। ওদের দেব আয়তলোচনা হুরীগণকে। ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। এটিই তো মহা সাফল্য" (৪৪।৫১-৫৭)।

"ওরা সেখানে পান করবে প্রস্রবণ-নিঃসৃত সুরা। সেই সুরা তাদের শিরঃপীড়া হবে না, বা তারা জ্ঞানও হারাবে না। ওরা পছন্দমত ফল মূল ও ঈপ্সীত পাখির মাংস খাবে। তাদের সৎ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তারা সেখানে পাবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ সুলোচনা সুন্দরীগণ" (৫৬।১৯-২৪)। **"তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী থাকবে। আমি তাদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি, ওদের চির কুমারী করেছি। তারা হবে সোহাগিনী ও সমবয়স্কা"** (৫৬।৩৪-৩৬)।

"জান্নাতে একজন ঘোষক থাকবে। সে ঘোষণা করবে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সুরক্ষিত আছে চিরস্থায়ী নীরোগ দেহ এবং তোমরা কোনদিন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। তোমাদের কোনদিন মৃত্যু হবে না। তোমরা অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবে। তোমরা চিরকাল যুবক থাকবে, কোনদিনও বৃদ্ধ হবে না। এই হল আল্লার জান্নাত যা তোমরা চিরকাল ধরে ভোগ করবে" (সহীহ্ মুসলীম - ৬৮০৩)। জান্নাতের হুরীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যর ডব্লু মূর (Sir W. Muir) বলেন, **"যতদিন নবী মহম্মদ মক্কায় একমাত্র পত্নী খাদিজাকে নিয়ে ঘর করছিলেন, ততদিন হুরীরা ছিল শুধু আল্লার পুরস্কার। কিন্তু খাদিজার মৃত্যুর পর হুরীরা হয়ে উঠল স্বর্গবাসীদের বৈধ পত্নী"** (Life Of Mahomet, Voice of India, New Delhi, 1992, pp-76).। তখন আল্লা বললেন **"প্রত্যেক স্বর্গবাসী দুজন করে স্ত্রী পাবে এবং তারা এত ফর্সা হবে যে মাংসের ভিতর দিয়ে তাদের পায়ের গোড়ালীর হাড় দেখা যাবে"** (সহীহ্ মুসলীম - ৬৭৯৩)।

কিন্তু জান্নাতবাসী মুসলমানরা প্রত্যেকে কতজন করে হুরী পাবে সে ব্যাপারে

কোন সঠিক নির্দেশ ইসলামী শাস্ত্রে অনুপস্থিত। প্রথমে বলা হল যে প্রত্যেক মুসলমান দুজন করে হুরী পাবে। কিন্তু নবী মহম্মদ যখন একের পর এক নিকা করতে শুরু করলেন এবং ২২ পত্নীর এক হারেম তৈরি করলেন, তখন জান্নাতে হুরীর বরাদ্দও বাড়তে থাকল। এবং জিহাদে নিহত শহীদদের জন্য ৭২ জন হুরী বরাদ্দ হল। কিন্তু মহম্মদের এক ঘনিষ্ঠ সহচর আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্য দিয়ে আরবের নবী মহম্মদের যে উদগ যৌন কামনা ফুটে উঠেছে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সেই হাদিসে বলা হচ্ছে, "**একজন অতিশয় পতিত ও সকল প্রকার দুষ্কর্মকারী মুসলমানও আল্লার জান্নাতে বিশাল এক জমিদারী পাবে। সেই জমিদারীতে থাকবে বিশাল বিশাল ৭০টা মুক্তার প্রাসাদ। প্রত্যেক প্রাসাদে থাকবে ৭০ চুনীর বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতে থাকবে পান্না দিয়ে তৈরি ৭০টা ঘর। প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০টা চৌকি। প্রত্যেক চৌকির ওপর পাতা থাকবে বিভিন্ন রঙের ৭০টা কার্পেট এবং প্রত্যেক কার্পেটের ওপর বসে থাকবে একজন করে হুরী। এছাড়া ৭০টা ঘরের প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০ জন দাসী।" আল্লা প্রত্যেক মুসলমানকে এত যৌন ক্ষমতা দেবেন যে, সে সমস্ত হুরী ও দাসীদের সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করতে সক্ষম হবে।**" হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক মুসলমান (৭০ X ৭০ X ৭০ X ৭০ X৭০) ১৬৮০৭০০০০০ বা ১৬৮ কোটি ৭ লক্ষ হুরী পাবে। (Ram Swarup, Understanding Islam Through Hadis, Voice of India, New Delhi, 1983, p-205)

গেলেমানদের কথা :

উপরে আল্লার স্বর্গ বা জান্নাতের যে বিবরণ দেওয়া হল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তা একটা পতিতালয় বা বেশ্যালয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব বেশ্যালয়ে যা যা থাকা প্রয়োজন, যেমন সুন্দরী নারী, উৎকৃষ্ট মদ্য, সুস্বাদু খাদ্য ইত্যাদি, আল্লা তার জান্নাতে সে সব কিছুরই অঢেল ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সব থেকে বড় কথা হল, যে কোন পার্থিব পতিতালয়ে ঐ সব ভোগ করতে গেলে টাকা পয়সা খরচ করতে হয়। কিন্তু আল্লার সেই সুপার ডিলাক্স পাঁচ তারা পতিতালয়ে সব কিছুই বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে। এসব ছাড়াও অতিশয় দয়ালু দয়াময় আল্লা তার পতিতালয়ে আরও একটা ভোগ্য বস্তুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যা কোন পার্থিব পতিতালয়ে পাওয়া দুস্কর। তা হল সমকাম বা পায়ুকাম করার জন্য অল্প বয়সের কিশোর বালক। আল্লার জান্নাতের অতীব সুদর্শন সেই অল্পবয়সী কিশোর

বালকদের নাম হল গেলেমান। আল্লার পতিতালয়ের হুরীদের বয়স যেমন ষোল-র বেশি হবে না, তেমনি গেলেমানদের বয়সও ষোল-র বেশি হবে না। তারা হবে চিরকিশোর।

তাই আল্লা কোরানে বলছেন, "**সেখানে তারা সুসজ্জিত আসেন সমাসীন হবে, তারা তীব্র গরম বা তীব্র শীত অনুভব করবে না। তাদের উপর সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া থাকবে, এবং ওর ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। সেখানে রজতশুভ্র পাত্রে তাদের পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতের সালসাবিল নামক প্রস্রবণের যান্‌যবীল নামক সুমিষ্ট পানি। তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে চির কিশোরগণ (বা গেলেমানগণ)। তাদের দেখে মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা**" (৭৬।১৩-১৯)। "**ওরা থাকবে সুখ সম্পদের স্বর্গোদ্যানে।—ওরা সেখানে স্বর্ণখচিত আসনে বসবে, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে এবং তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে চির কিশোররা**" (৫৬।১২-১৭)

জান্নাত নামক আল্লার সেই পতিতালয়ে একজন মুসলমান কতজন গেলেমান পাবে, সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। একটা হাদিস বলছে যে, ছোট বড়, সব মুসলমানই ১০০০ গেলেমান পাবে। মহম্মদের এক অনুচর আনাস বর্ণিত একটি হাদিস বলছে, প্রত্যেক স্বর্গবাসী মুসলমান ১০,০০০ গেলেমান পাবে। **আবু সইদ বর্ণিত একটি হাদিস মতে কেউ ১০০০ এর কম এবং ৮০,০০০ এর বেশি গেলেমান পাবে না।** (Ram Swarup, ibid, p-205).

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পার্থিব পতিতালয়ের মত আল্লার পতিতালয়েও সুরা, নারী ও সুস্বাদু খাদ্য বস্তু থাকবে, তবে কিছু তফাৎ থাকবে। যেমন (১) আল্লার পতিতালয়ের সুরা যে যত খুশি খাক না কেন, তাতে কারও মাথার যন্ত্রণা হবে না। (২) আল্লার পতিতালয়ে কারও মল মূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সেখানে কারও সর্দি কাশি বা অন্য কোন অসুখ বিসুখ হবে না। (৩) আল্লার পতিতালয়ে সবাই সুস্বাদু জান্নাতি খাবার খাবে, জান্নাতি গাছের অতিশয় সুস্বাদু ফল মূল খাবে। (৪) সেখানে তারা যে সুন্দরী রমণীদের পাবে তারা হবে হরিণ নয়না ১৬ বছর বয়সী চির কুমারী এবং তারা যে সব পোশাক পরবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে। (৫) তারা এত ফর্সা হবে যে তাদের গোড়ালীর হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে। (৬) সেই সুন্দরীদের সঙ্গে যৌন মিলন ৬০০ বছর স্থায়ী হবে (Aldous Huxley, *moksha,* chatto & Windus, London, 1980, p-

112)। (৭) এছাড়া আল্লার সেই পতিতালয়ে থাকবে ১৬ বছর বয়সী সুন্দর সুন্দর হাজার হাজার কিশোর বালক, যাদের সঙ্গে জান্নাতবাসীরা মনের সুখে সমকাম বা পায়ুকাম করবে। সব থেকে বড় কথা হল, আল্লার এই পতিতালয়ে যাবার জন্যই দুনিয়া ভর্তি মুসলমান নামাজ, রোজা আর হজ করে চলেছে।

আল্লার পতিতালয়ের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য :

এ টি এম রফিকুল হাসান নামে একজন আলেম **আট বেহেস্ত ও সাত দোজখ** (মুসলীম লাইব্রেরী, কলকাতা) নামে একখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ের ব্যাপারে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি সমগ্র মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। যেমন আল্লার জান্নাতের একটা আঙুরে যে রস হবে তাতে একটা পিপে ভর্তি হয়ে যাবে। আল্লার জান্নাতের একটা খেজুর হবে ১২ হাত লম্বা এবং তাতে কোন বীচি থাকবে না। আল্লার জান্নাতের গাছপালা হবে বিচিত্র রকম। তারা যে কোন রকমের নড়াচড়া তো করবেই, এমন কি হাঁটাচলাও করবে। যদি কোন জান্নাতবাসী দূরবর্তী কোন গাছের ফল খেতে ইচ্ছা করে, তবে সেই গাছ তার কাছে এগিয়ে আসবে এবং মুখে ফল গুঁজে দেবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন জান্নাতবাসী কোন হুরীর সঙ্গে রতি ক্রিয়া শুরু করলে তা ৬০০ বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু তার বীর্য স্খলন কেমন হবে? এ ব্যাপারে আলোকপাত করে রফিকুল হাসান মহাশয় মনুষ্য জাতির যে উপকার করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি লিখছেন যে, আল্লার রসুল মহম্মদকে এক অনুচর এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মহম্মদ বলেন যে, আল্লার জান্নাতে বীর্য ও তার স্খলন হবে পার্থিব বীর্য ও তার স্খলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ে বীর্য হবে সুগন্ধী বাতাসের মত এবং সেই বীর্য স্খলনের সময় একজন জান্নাতবাসী যে আনন্দ পাবে তা পার্থিব বীর্য স্খলনের থেকে লক্ষ গুণ বেশি। তাছাড়া, পার্থিব বীর্য স্খলন মানুষকে দুর্বল করে দেয় এবং মিলনের ইচ্ছাকেও কমিয়ে দেয়। আল্লার পতিতালয়ে সেই অদ্ভুত বীর্য স্খলন মানুষকে লক্ষগুণ শক্তিশালী করবে এবং মিলনের ইচ্ছাকেও লক্ষগুণ বাড়িয়ে দেবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুর অন্তিম লক্ষ্য মোক্ষ ও মুসলমানের অন্তিম লক্ষ্য জান্নাত যেন দুই মেরুর দুই তত্ত্ব। হিন্দুর মোক্ষ লাভের প্রথম কথাই হল ত্যাগ। ত্যাগ, তিতিক্ষা, ঐকান্তিক ভক্তি ও নিরন্তর সাধনা দ্বারা নিজেকে ব্রহ্মের মতই নির্মল ও পবিত্র করতে হবে, তবেই সেই ব্রহ্মকে জানা যাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ব হওয়া যাবে। নিজেকে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করা যাবে। পক্ষান্তরে, ইসলামী শাস্ত্রে ত্যাগের কোন কথাই নেই। সেখানে শুধু ভোগ। ইহকালে ভোগ এবং পরকালেও ভোগ। কোরানে আল্লা কোথাও বলেননি যে, ওহে মুসলমানগণ, তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। সৎ ও নৈতকি জীবন যাপন কর। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও নির্মল কর। পক্ষান্তরে আল্লা বলছেন যে, ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলেই সব আপনি থেকে হয়ে যাবে। যত দুষ্কর্ম, যত পাপ, সব মাফ হয়ে যাবে, এবং অন্তিমে আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকারী হবে। আর সেই জান্নাত যে আসলে একটি পতিতালয়, তা আগেই বলা হয়েছে। জান্নাত নামক সেই পতিতালয়ে আছে অঢেল ইন্দ্রিয় সুখ। কিন্তু ''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' প্রবন্ধের নির্বোধ লেখক নাকি ইসলামের মূলে প্রবেশ করে দেখেছেন, বাহ্যিক ক্রিয়াকান্ডে কিছু পার্থক্য থাকলেও, সনাতন বা হিন্দু ধর্ম আর ইসলাম নাকি একই। কোন সাধারণ ব্যক্তি এই রকম গাধার মত কথা বললে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এই কথা লিখছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু, আর সেই গর্দভোচিত লেখা ছাপা হচ্ছে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকায়। এইসব গর্দভরা হয়তো ভাবেন যে, তাঁরা যা কিছু লিখতে পারেন এবং তাঁদের লেখার সম্বন্ধে বলার কেউ নেই।

''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' প্রবন্ধের লেখক তারপর লিখছেন, ''ইহা সত্য যে, হিন্দু ধর্মের ক্রিয়াকান্ড মুসলমান সমাজের ক্রিয়াকান্ড হইতে পৃথক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, ক্রিয়াকান্ড পৃথক হইলেও দুই ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে।'' হিন্দুর ক্রিয়াকান্ড বলতে, এক সময়ে, বৈদিক যুগে ছিল হোম-যজ্ঞ। তখন মূর্তি পূজার তত চল ছিল না। কিন্তু আজ মঠ মন্দিরে মূর্তি পূজাই হিন্দুর প্রধান ক্রিয়াকান্ড হয়ে উঠেছে। এই মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে হিন্দু তার শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরমেশ্বরকে

নিবেদন করে। নিজের চিত্তশুদ্ধি করে। অন্যায় কাজ ও অন্যায় চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে। তাই হিন্দুর মূর্তি পূজাকে বলা চলে পরমেশ্বরে কাছে বিনম্র আত্মনিবেদন।

মুসলমানদের ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে যেটা আমাদের সব থেকে বেশি চোখে পড়ে তা হল নামাজ। আমরা দেখি যে, তারা পশ্চিম দিকে মুখ করে সুন্দর করে সারি বেধে দাঁড়িয়ে নামাজ করছে। ইমামের আদেশ অনুসারে কখনও আল্লাহু আকবর বলতে বলতে বসে নমস্কার করছে, কখনও আবার আল্লাহু আকবর বলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ইত্যাদি। বেশিরভাগ হিন্দুই এই মনোভাব পোষণ করেন যে, ইসলামের চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল স্বর্গ বা জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ে যাওয়া। সেই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা' কলেমা গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত পাপমতি অধঃপতিত মুসলমানকেও আল্লা তাঁর স্বর্গে নিয়ে যাবেন। কাজেই স্বর্গে যাবার জন্য নামাজের প্রয়োজন নেই এবং রোজারও প্রয়োজন নেই। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, তবু কেন মুসলিমরা দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে এবং একমাস ধরে রোজা রাখে?

হিন্দু বলে, ভগবানকে ডাকতে হয় একা একা, নির্জনে গিয়ে। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্র মতে নির্জনে একা একা নামাজ পড়লে খুব কমই পুণ্য হয়। মহল্লার মসজিদে পড়লে তার দশ গুণ এবং জাম-এ মসজিদে পড়লে তার একশ গুণ এবং এইভাবে বাড়তে বাড়তে মক্কার মসজিদুল হারামে পড়লে তার এক লক্ষ গুণ পুণ্য হয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, নামাজের মূল উদ্দেশ্য হল মসজিদে লোক জড়ো করা। তারপর সারি বেধে দাঁড়ানো, ইমামের আদেশ মত ওঠা বসা ইত্যাদি দেখলে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, **নামাজের মূল উদ্দেশ্য হল প্রথমত মসজিদে লোক জড়ো করা এবং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে দেখাশোনা ও কথা বার্তার মধ্যে দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধতা বাড়িয়ে তোলা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল নামাজের মধ্যে দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ।** এই কারণে মহম্মদদের জীবিত কালে **মুসলমানরা খুব ভোরে, ফজর**-এর নামাজ শেষ করে আক্রমণ করতো। গত ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট মুসলমানরা কোলকাতায় যে দাঙ্গা শুরু করেছিল, যার নাম **"গ্রেট ক্যালাকাটা কিলিং"**, সেই ভয়ঙ্কর দাঙ্গাও তারা শুক্রবারের জুম্আর নামাজ শেষ করে মসজিদ থেকেই শুরু করেছিল।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, মৃত্যুর পর জান্নাত বা আল্লার

পতিতালয়ে যাবার জন্য নামাজের প্রয়োজন না থাকলেও জিহাদের জন্য নামাজের প্রয়োজন আছে। এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দুনিয়া ব্যাপী মুসলিম সমাজ দিনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ করে চলেছে কোরানের প্রথম সুরা বা অধ্যায়ের নাম "ফাতেহা"। নামাজের শুরুতে প্রত্যেক নামাজীকে মনে মনে আরবীতে সুরা ফাতেহা আবৃত্তি করতে হয় এবং তারপর কোরানের অনন্ত তিনটি আয়াত আবৃত্তি করতে হয়। **সাধারণত কোরানে কাফের নিধনের যে সব ভয়ঙ্কর আয়াত আছে, তা থেকে ওই তিনটি আয়াত আবৃত্তি করা হয়ে থাকে।** কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, দিনে ৫ বার করে ওইসব কাফের নিধনের আয়াত আবৃত্তি করতে থাকলে একজন মানুষের মনে কাফেরদের প্রতি কতখানি ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে এবং কাফের নিধনের ব্যাপারে তার মন কতখানি হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

তারপর আছে নামাজের শেষ ইমামের খুৎবা বা ধর্মীয় ভাষণ। এই খুৎবায় কি বলা হয় তা অনেকেরই জানা নেই। তাই পবিত্র ঈদের নামাজের পর ইমাম যে খুৎবা দেন, তা খানিকটা তুলে দেওয়া হল।"—হে আল্লা, (আপনি) ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন, আর অবাধ্য কাফের, বেদায়াতি ও মোশরেকদের সর্বদা পদানত ও পরাস্ত করুন। হে আল্লা, যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে, তার রাজ্য চির অক্ষত রাখুন। তিনি রাজার পুত্র রাজা হোন কিংবা খাকান পুত্র খাকান হোন, স্থল বা নদী পথের অধিকর্তা হোন, কিংবা দুই সাগরের মালিক হোন, তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনার সেবক হোন, কিংবা আল্লার পথে জেহাদ ও সংগ্রামকারী হোন, তিনি যদি মুসলিম রাজা হোন, আল্লা তার রাজ্য ও অধিকৃত সাম্রাজ্যকে চির অক্ষয় রাখুন। এবং তাঁরই তরবারি দ্বারা বিদ্রোহী, মহাপাতকী ও অবাধ্যদের (অর্থাৎ কাফেরদের) মস্তকচ্ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। হে আল্লা তাদের ঐক্যের মধ্যে মতানৈক্য আনয়ন করুন। হে আল্লা তাদের দল ও সঙ্ঘকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিন।" (মুসলিম পঞ্জিকা - ১৪০০ বঙ্গাব্দ, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ১৬৯)

ইসলামী রীতি অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান বালককে ৭ বছর বয়স থেকে নামাজ শিক্ষা দেবার বিধি। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ৭ বছরের শিশু বয়স থেকে কোন মানুষকে দিনে ৫ বার করে কাফের নিধনের মন্ত্র দিলে তার মন কতখানি কলুষিত হতে পারে, বা কতখানি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এবং হিংসাত্মক

হয়ে উঠতে পারে। এক কথায় কতখানি অমানুষ হয়ে উঠতে পারে।

নামাজের মত রোজার উপকারিতাও জিহাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যে আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, সেখানে জলের বড় অভাব। অনেক সময় এমন হত যে, মদীনা থেকে অনেক দূরে নবী তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে জিহাদ করতে গেলেন। সারাদিন ধরে যুদ্ধ করতে হল। কিন্তু খাওয়া দাওয়া দূরে থাক, পিপাসায় এক ফোটা জলও জুটল না। এইরকম পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্যই পানহার ত্যাগ করে একমাস রোজা পালন। এটাও সামরিক প্রশিক্ষণের একটা অঙ্গ এবং ইংরাজীতে একে বলা হয় Endurance Training বা প্রতিকূলতা সহ্য করার প্রশিক্ষণ। সেই রকম, বকরীদের দিন চাকু দিয়ে পুচিয়ে পুচিয়ে নৃশংসভাবে পশু কাটা হল, কাফেরদের গলাকাটার হাতে কলমে শিক্ষা।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, ইসলামী শাস্ত্রমতে মুসলমানদের সর্বপ্রধান ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড হল জিহাদ। নামাজ বা রোজা নয়, জিহাদ হল আল্লার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এইজন্য আল্লা একদিনের জিহাদকে হাজার দিনের নামাজের সমান করে দিয়েছেন এবং জিহাদীর জন্য রোজা পুরোপুরি মাফ করে দিয়েছেন। কোন মুসলমান নামাজ করল কি করল না, রোজা রাখল কি রাখল না, আল্লা তার তেমন খোঁজ খবর রাখেন না। কিন্তু জিহাদের সময় কোন সক্ষম মুসলমান জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে বসে থাকলে আল্লা সেই অপরাধ ক্ষমা করেন না। কারণ জিহাদ হল সমস্ত সক্ষম পুরুষ মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কাজেই জিহাদ সম্পর্কে দু' চার কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন।

অনেক হিন্দু আছেন যাঁরা জিহাদের বাংলা লেখেন ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু হিন্দুরা ধর্মযুদ্ধ বলতে বোঝেন, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ। বা ধর্মাশ্রিত মানুষের সঙ্গে অন্যায়কারী, অসুর প্রকৃতির মানুষের যুদ্ধ। হিন্দুর এই ধর্মযুদ্ধে যে কোন অসামরিক ব্যক্তি, নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা শুধু অবধ্যই নয়, তাদের হত্যা করা মহাপাপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিন্দুর ধর্মযুদ্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেখানে যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে পিতামহ ভীষ্ম যেসব নিয়ম কানুনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা থেকে হিন্দুর ধর্মযুদ্ধের চরিত্র বোঝা যায়।

কিন্তু জিহাদ হল পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত রকম বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে বর্বরতম ও সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যালীলা। তিনটি ইংরাজী শব্দের মাধ্যমে জিহাদের বর্বরতাকে প্রকাশ করতে সুবিধা হয়, তাহল by sword, fire

and rape বা তরবারি, আগুন ও ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাফের হত্যা করে তাদের সহায়, সম্বল, ধন-দৌলত লুট পাট করে তাদের জমি জায়গা দখল করার নামই জিহাদ।

বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীরা যখন ভারত আক্রমণ করল, তখন থেকেই এই ভারতবর্ষে জিহাদের বর্বরতার অনুষ্ঠান শুরু হল। তারা কোন নিয়ম নীতির ধার ধারল না। লক্ষ লক্ষ পরাজিত হিন্দু সৈন্যকে কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসামরিক প্রজা হত্যা করে মৃত মানুষের পাহাড় তৈরি করল। তাদের ঘরবাড়ি ও ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। যে যে যুদ্ধে হিন্দু রাজারা বিজয়ী হতেন, সেইসব ক্ষেত্রে তাঁরা বহুদিনের সভ্যতার সংস্কার বশত পরাজিত মুসলমান সৈন্যদের মুক্ত করে দিতেন। পক্ষান্তরে মুসলমানরা পরাজিত হিন্দু বাহিনীর সকলকেই কোরানের কাফের নিধনের নির্দেশানুসারে হত্যা করত। তাই হিন্দু রাজারা যে বার বার মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছেন তারজন্য হিন্দু সভ্যতার সংস্কারও অনেকাংশে দায়ী। পরাজিত শত্রু অবধ্য, এই সভ্য সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়েই রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান মহম্মদ ঘোরীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সুসভ্য আচরণই তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ডেকে এনেছিল। (বিশদ বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের **'মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি'** দ্রষ্টব্য)।

এই পৃথিবীতে যত দেশ আছে, ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে তা দুই ভাগে বিভক্ত। **দার উল-ইসলাম হচ্ছে সেই সমস্ত দেশ, যেগুলো ইতিমধ্যে ইসলামের অধিকারে চলে এসেছে।** বর্তমানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, মিশর ইত্যাদি দার-উল-ইসলাম এর নির্দশন। দার-উল-হার্ব এর আক্ষরিক অর্থ হল সন্ত্রাসের দেশ বা Land of violence। প্রকৃতপক্ষে **দার-উল-হার্ব হল সেই সমস্ত দেশ, যেগুলো এখনও মুসলমানদের অধিকারে আসেনি এবং যেখানে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে।** তাই সেগুলো হল হিংসা ও রক্তপাতের দেশ। সেই কারণে ভারতও একটি দার-উল-হার্ব।

ইসলামের অন্তিম লক্ষ হল পৃথিবীর সমস্ত দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করে সমগ্র বিশ্বে আল্লার রাজত্ব কায়েম করা। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে আরবের সাংস্কৃতিক ক্রীতদাসে পরিণত করা। তাই কোরান বলেছে, "তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্দে অবিরাম যুদ্ধ

করতে থাকো, যতদিন না আল্লার রাজত্ব কায়েম হয়" (ঐ - ৮/৩৯)। ইসলামী মতে পৃথিবীতে যতদিন কাফের থাকবে এবং দার-উল-হার্ব থাকবে, ততদিন ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তি (ফিৎনা ফাসাদ) ও থাকবে। যেদিন সমস্ত পৃথিবী দার-উল-ইসলামে পরিণত হবে, একমাত্র সেই দিনই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কারণে অনেক দুষ্ট ব্যক্তি বলেন যে, ইসলামের অর্থ শান্তি।

যাই হোক, কোন্ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে হবে? কোন্ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে হবে? এখানে জিহাদ এর আগমন। কাজেই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল, সারা পৃথিবীতে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করা। সমগ্র পৃথিবীকে ইসলাম তথা আরবের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। এই কারণেই বলা চলে যে, ইসলাম কোন ধর্মমত নয়, ইসলাম হল একটি রাজনৈতিক মতবাদ। যেহেতু জিহাদ হল এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সামরিক অঙ্গ, তাই ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে আল্লা প্রত্যেক সক্ষম মুসমলমানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন (কোরান-২/২৪৪)। যারা জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের নিন্দা করেছেন (ঐ - ৪/৮-২৯) এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মুসলমানদের অত্যন্ত নির্মম হতে বলেছেন (ঐ-৪/৮-২৯)।

জিহাদের গুরুত্ব এতই অপরিসীম বলেই আল্লা একদিনের জিহাদকে হাজার দিনের নামাজের সমান করে দিয়েছেন এবং জিহাদকারীর জন্য রোজা সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েছেন। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার কোরেশদের বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রমজান মাস রোজার মাস। যুদ্ধের আগে মহম্মদ সর্বপ্রথম নিজে রোজা ভাঙেন এবং অন্য সবাই পরে রোজা ভাঙে। খয়বর অভিযানের সময় (৬২৯ খৃঃ) একজন ইহুদী যুবক সকালে ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে যোগ দেয় এবং দুপুরে যুদ্ধে মারা যায়। তাই সে একবারও নামাজ পড়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু মহম্মদ বলেন যে, জিহাদে শহীদ হবার ফলে সে মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লার স্বর্গে বা জান্নাতে চলে গিয়েছে।

জিহাদে উদ্দীপিত করার জন্য আল্লা জিহাদ-লব্ধ লুঠের মাল বৈধ করে দিয়েছেন। **জিহাদ-লব্ধ কাফের নারীও লুটের মাল বা গণিমতের মাল। তাই আল্লা জিহাদ-লব্ধ কুমারী, সধবা, বিধবা, বৃদ্ধা যে কোন রকমের কাফের নারী**

মুসলমানদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। জিহাদে উদ্দীপিত করতে আল্লা আরও বলেছেন, ''অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওঁৎ পেতে থাকবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে'', (কোরান-৯/৫)। ''যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে'' (ঐ-২/১৯১)। ''তাদের গ্রেপ্তার কর, যেখানে পাও হত্যা কর, তাদের মধ্যে থেকে সাহায্যকারী গ্রহণ করো না'' (ঐ-৪/৮৯)। ''অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক (ঐ-৯/১২৩)।'' ''আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে'' (ঐ-২১/১০৫)। ''তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না অশান্তি দূর হয় এবং আল্লার রাজত্ব কায়েম হয়'' (ঐ - ৪৭/৪)। ''তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক দরে কর্তন কর'' (ঐ - ৫/৩৩)। ''ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেইখানেই ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে'' (ঐ-৩৩/৬১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলমানকে বলে মুজাহিদ (বা আল্লার সৈনিক এবং বহুবচনে মুজাহিদিন)। আল্লার অন্তিম ইচ্ছা হল মুজাহিদদের সাহায্যে পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মকে বিনাশ করে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠ করা। তাই মুসলমানদের জিহাদে উদ্দীপিত করতে আল্লা আরও বলেছেন, **''আল্লার দৃষ্টিতে জিহাদের সমতুল্য মহৎ কাজ আর কিছুই নেই'' (৯/১৯) এবং ''বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষমতা ব্যতীত ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লার পথে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়।—যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর জিহাদকারীদের আল্লাহ মহাপুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন''** (৪/৯৫)। ''যে কোন ব্যক্তি, যার পা আল্লার পথে জিহাদ করতে গিয়ে ধুলিমলিন হয়েছে, নরকের আগুন তার নিষিদ্ধ করা হয়েছে'' (বোখারি শরিফ-৮/৬৬)। যে সব ব্যক্তি শারীরিক দিক থেকে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও জিহাদে যোগ না দিয়েও ঘরে বসে থাকে, আল্লা তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলেছেন, ''যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তবে তিনি (আল্লা) তোমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দিবেন, এবং অপর কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'' (৯/৩৯)।

জিহাদে সফল হতে গেলে প্রথমেই দরকার সামরিক শৃঙ্খলা। তাই আল্লা

বলেচেন, ''যারা আল্লার পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সংগ্রাম করে, আল্লা তাদের ভালোবাসেন'' (৬১/৪)। সামরিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একজন ব্যক্তিই থাকেন, যিনি সর্বোচ্চ আদেশ দেন এবং বাহিনীর সবাই তার আনুগত্য করে। একাধিক ব্যক্তি হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই আল্লা সকল জিহাদীকে আল্লার রসুলের আনুগত্য ক রতে আদেশ দিয়ে বলেছেন, ''যারা তোমার (আল্লার রসুল মহম্মদের) নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, তারা তো আল্লার আনুগত্যেরই শপথ গ্রহণ করে,'' (৪৮/১০)। সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লা জিহাদীদের স্বর্গীয় সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছেন যে, তিনি ৫০০০ ফেরেস্তা বা দেবদূতকে জিহাদীদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাবেন, যাতে তারা জয়ী হতে পারে (৩/১২; ৪/১২৫)। ''তোমরা শিথিল হয়ো না, ও বিষণ্ণ হয়ো না। তোমরাই সমুন্নত যদি তোমরা (প্রকৃত) বিশ্বাসী হও'' (৩/১৩৯)।

আল্লা আরও বলেছেন, ''যারা বিশ্বাসী তারা আল্লার পথে যুদ্ধ করে, এবং যারা অবিশ্বাসী তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে, নিশ্চয়ই শয়তান এক দুর্বল চক্রান্তকারী'' (৪।৭৬)। ''হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন কোন (কাফের) বাহিনীর সম্মুখীন হও, তোমরা অবিচলিত থাকবে এবং মুখে ও মনে আল্লাকে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত হও'' (৮/৪৫)। ''যদি আল্লা তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেহ জয়ী হতে পারবে না, এবং তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে কে আর তোমাদের সাহায্য করবে'' (৩/১৬০! ''হে নবী, বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধে উদ্দীপিত কর, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়ি জন ধৈর্য্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্য একশ জন থাকলে তারা এক হাজার জন অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী হবে'' (৮/৬৫)। পক্ষান্তরে জিহাদ করতে এসে জিহাদের ময়দান থেকে ভয়ে পলায়ন করলে আল্লার চোখে তা হবে অতিশয় গর্হিত কাজ এবং তার শাস্তি হবে ভয়ঙ্কর। তাই আল্লা বলেছেন, ''হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা (জিহাদে) অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে হবে আল্লার বিরাগভাজন এবং তার আশ্রয় হবে নরক'' (৮/১৫-১৬)।

আগেই বলা হয়েছে যে, জিহাদ করতে গিয়ে যারা শহীদ হবে, আল্লার জান্নাতে তারা হবে আল্লার বিশিষ্ট অতিথি। এই ব্যাপারে আল্লা বলেছেন ''যারা আল্লার পথে নিহত হয়েছে, তাদের তোমরা কখনও মৃত মনে করো না। (আল্লার দৃষ্টিতে)

তারা জীবিত এবং প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা উত্তম জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে" (৩/১৬৯)। "যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা আল্লার পথে সংগ্রাম করলে সে মরুক বা বাঁচুক, আমি তাকে মহান প্রতিদান দিব" (৪/৭৪)। কোন মুসলমানের পক্ষে জিহাদে শহীদ হওয়া এতই লাভজনক যে, একজন মুজাহিদ বলবে, "আমি আল্লার পথে জিহাদ করে শহীদ হব, এবং শহীদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠব এবং শহীদ হব, শহীদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠব এবং শহীদ হব, এবং শহীদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠব" (বোখারী ৪/৫৪)।

জিহাদে শহীদ হওয়া কত উপকারী ও লাভজনক তা বোঝাতে নবী মহম্মদ বলতেন যে, (১) শহীদের আত্মা সবুজ পাখী হয়ে স্বর্গে বসবাস করবে এবং স্বর্গের যেখানে সেখানে উড়ে বেড়াবে। (২) তাদের সমস্ত গোনা (পাপ) ও কুকর্ম ক্ষমা করা হবে। (৩) কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন সেই শহীদ তার ৭০ জন আত্মীয় ও বন্ধুর জন্য আল্লার বিচারের হস্তক্ষেপ করতে পারবে। (৪) কেয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে সে অবিচলিত থাকবে। (৫) সে মৃত্যুর কোন কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভব করবে না। (৬) কাফেরদের হত্যা করার ব্যাপারে সে কোন অনুতাপ দুঃখ ভোগ করবে না।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, জিহাদ ও জিহাদে শহীদ হবার উপরিউক্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, ইরাক, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি ইসলামী দেশগুলোর হাজার হাজার যুবক যুবতী সন্ত্রাসবাদী বা আত্মঘাতী বোমা বা suicide bomber (ফিদায়িন) হবার জন্য এগিয়ে আসছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ইসলামের ব্যাপারে কতখানি অজ্ঞ ও মূর্খ হলে তার পক্ষে বলা সম্ভব, "ইহা সত্য যে, হিন্দু ধর্মের ক্রিয়াকান্ড মুসলমান সমাজের ক্রিয়াকান্ড হইতে পৃথক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, ক্রিয়াকান্ড পৃথক হইলেও দুই ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে।" এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কেন তিনি গরুর মত ধীরভাবে লক্ষ্য করার ফলে দেখতে পেয়েছেন যে, "ক্রিয়াকান্ড পৃথক হইলেও দুই ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে।"

লেখকের মূর্খতা কত গভীর সেটা আরও স্পষ্ট করার জন্য তিনি লিখছেন, "প্রতিটি ধর্মের বাহ্য ক্রিয়াকান্ডের উপর দেশ, কাল ও পাত্র প্রভাব বিস্তার লাভ করিলেও অন্তরালয় প্রবাহিত হইতেছে একই ধারা - একই আদর্শের অবিচ্ছিন্ন

স্রোত। ধর্মের ক্রমান্বয়ের ইতিহাস বলিতেছে, বিভিন্ন ধর্ম কখনও পরস্পর বিরোধী হইতে পারে না। সকল ধর্মই প্রেম ও ভালবাসার কথা বলিতেছে। পরম করুণাময় ঈশ্বর ও প্রেমময় আল্লাহ-র মহান বার্তাবহগণ যুগে যুগে দেশে দেশে উক্ত প্রেমের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। ধরায় ইসলাম জগৎ উক্ত প্রেমের পথেই প্রেম বিতরণের সর্বকনিষ্ঠ পথিকরূপে সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয় সমাজে পদার্পণ করিয়াছে।"

৭

এরপর লেখক ইসলামের প্রবর্তক নবী মহম্মদ সম্পর্কে লিখছেন, "হজরত মহম্মদের মক্কার মহাপ্রতিকূল নিঃস্ব জীবনের যে চিত্রটি আমরা লাভ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার অসীম ধৈর্য ও সহ্যের জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অপরদিকে মদীনার মুকুটবিহীন শক্তিধর মহানবীর জীবনে যাহা লাভ করিলাম তাহা একান্ত ক্ষমা ও দয়ার আদর্শ। তাঁহার মহাজীবনের আচরিত ধর্মই মহৎ শিক্ষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইসলাম তাই ধৈর্য ও সহ্যের ধর্ম এবং ক্ষমা ও দয়ার ধর্ম-একটি বাক্যে প্রেম ও ভালবাসার ধর্ম।" উপরিউক্ত মন্তব্যগুলো পাঠ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লেখক ইসলাম সম্পর্কে একটি সত্যনিষ্ঠ তাত্ত্বিক আলোচনা, বা ইসলাম বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত অজ্ঞতার জন্য এইসব কথা লেখেননি। এইসব কথা লেখার মূল উদ্দেশ্য হল, অ-মুসলমান, বিশেষ করে হিন্দুদের, ইসলাম বিষয়ে প্রতারিত করা, বা তাদের মনে ভ্রান্তি উৎপন্ন করা। তাই সমগ্র হিন্দু সমাজের উচিত "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" প্রবন্ধের লেখককে ধিক্কার জানানো, যাতে তিনি ভবিষ্যতে এইরকম কোন অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

যে কেহ ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ ও প্রথম চারজন খলিফার জীবনের যৎ সামান্য অবগত আছেন, তিনিই জানেন যে, একমাত্র প্রথম খলিফা আবু বকর বাদে বাকি তিনজন খলিফা ওমর, উসমান ও আলি গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকা দ্বারা মৃত্যু বরণ করেন। এ ব্যাপারেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, স্বেচ্ছায় খলিফার পদ ছেড়ে না দিলে ঘাতকের ছুরিতেই আবু বকরের মৃত্যু হত। এসব ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, ইসলাম হল ধৈর্য ও সহ্যের ধর্ম এবং ক্ষমা ও দয়ার ধর্ম একটি বাক্যে প্রেম ও ভালবাসার ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হল ঘৃণা,

ঈর্ষা, খুনোখুনী ও রক্তপাতের ধর্ম। এ ব্যাপারে স্বামীজীর মন্তব্য আগেই দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর মত বিশ্বের অন্যান্য মনীষীগণও ইসলামকে একটি চূড়ান্ত ঘৃণা ও রক্তপাতের ধর্ম বলেই চিহ্নিত করে গিয়েছেন। অনেকে এটাও বলে গিয়েছেন যে, যদি ইসলাম বা কোরানের রক্তাক্ত বাণীর আবির্ভাব না হত তবে এই বিশ্ব মনুষ্যবাসের পক্ষে আরও সুখকর স্থান হত।

ইসলামের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় শ্রী কালিদাস নাগ মহাশয়কে একখানা পত্রে লিখেছেন, ''এই পৃথিবীতে দুটি ধর্ম আছে, যাদের সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্মের চির বৈরিতা বর্তমান। এই ধর্ম দুটি হল ইসলাম ও খৃস্টধর্ম। এরা শুধু নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, পরন্তু অন্য সমস্ত ধর্মকে (ঘৃণা, হিংসা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে) বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর। তাই এদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের একটাই রাস্তা আছে, আর তা হল তাদের ধর্ম গ্রহণ করা।'' সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অতিশয় বাস্তব সম্মত ও যুক্তিপূর্ণ। এ ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, ''দুটি কি তিনটি ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম, খৃস্টধর্ম ও ইহুদিদের ধর্ম জুদাইজম) দাবি করে যে, একমাত্র তাদের ধর্মকে অনুসরণ করলেই স্বর্গলাভ হবে। কাজেই তাদের সঙ্গে (হিন্দু ধর্মের) বিবাদ অনিবার্য।'' (প্রবন্ধ - ''আত্ম পরিচয়'')। ইসলাম প্রেম ভালবাসার ধর্ম হলে রবীন্দ্রনাথ কখনোই এইসব মন্তব্য করতেন না। কাজেই ইসলামকে প্রেম ভালবাসার ধর্ম বলার মধ্য দিয়ে ''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' প্রবন্ধের লেখক যে একটা হায়নাকে ছাগলের চামড়া দিয়ে আবৃত করে তাকে অতিশয় নিরীহ ও অহিংসক সাজাতে চেয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক, ইসলামের সঙ্গে নবী মহম্মদের জীবন এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, তাঁর জীবনী না জানলে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। বিগত ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট বা ১২ই রবিউল, সোমবার, মক্কা নগরীর সুগুল্লাইল এলাকায় নবী হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ তাঁর জীবনে যেসব কীর্তি রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সমগ্র পৃথিবীকে নররক্তে কর্দমাক্ত করার জন্য ইসলাম নামক এক বর্বর তত্ত্ব আবিষ্কার করা, আরবের কাফেরদের গণহত্যা, ৮০০ কুরাইজা ইহুদির গণহত্যা, খয়বর আক্রমণ করে নজির গোষ্ঠির ইহুদীদের গণহত্যা, ৮জন উকল বেদুইন বীভৎস হত্যা, বিদায় হজের সময় এক নাগাড়ে ৬৩টা উট কোরবানী, ৫২ বছর বয়সে ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করা,

৫৮ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদের ৩৫ বছর বয়স্কা পত্নী জয়নবকে বিয়ে করা এবং উপপত্নী মারিয়া সহ ১২ জন (মতান্তরে ২২ জন) পত্নীর হারেম তৈরী করা।

মক্কায় এক নাগারে ১৫ বছর খাদিজার সঙ্গে নিষ্ঠার সাথে ঘর করার ফলে অনেকের মনে হতে পারে যে, নবী বুঝি খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে তখন দ্বিতীয় কোন পত্নী গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন খাদিজার আশ্রিত। মদিনায় আসার পর খাদিজার মৃত্যু তাঁকে দিল বহু আকাঙ্খিত মুক্তি। তখন থেকেই নবী একের পর এক নিকা করতে লাগলেন। হিজমীর প্রথম বছরে বন্ধু আবুবকরের কন্যা ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে, তৃতীয় বছরে হাফসা ও জয়নবকে, পঞ্চম বছরে পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে এবং জয়েরীয়া নাম্নি ক্রীতদাসীকে এবং সপ্তম বছরে উম্মে হাবিরা, সাফিয়া, মাইমুনা ও মিসরীয় করীতদাসী মরিয়াকে নিকা করে ১২ জন বিবির হারেম তৈরী করলেন। সুন্নী মুসলমানদের মতে মহম্মদ এই ১২ পত্নীকে নিকা করেছিলেন, কিন্তু শিয়া মুসলমানদের মতে তিনি আরও ১০ জন, অর্থাৎ মোট ২২ পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। এই ২২ জন পত্নীর নাম যথাক্রমে, (১) খাদিজা, (২) সৌদা, (৩) আয়েশা, (৪) হাফসা, (৫) জয়নব বিন্ত খোজাইমা, (৬) মারিয়া, (৭) জয়নব বিন্ত আশ, (৮) জয়েরিয়া, (৯) উম্মে হাবিবা, (১০) সফিয়া, (১১) মাইমুনা, (১২) উম্মে সালামা, (১৩) সানা, (১৪) আল সামা, (১৫) ঘাজিয়া, (১৬) আমরাহ, (১৭) আসমা, (১৮) লায়লা, (১৯) কুতায়লা, (২০) ফতিমা, (২১) কাওলা এবং (২২) আল আলিয়াহ্। মহম্মদ পালা করে এক এক বিবির ঘরে রাতকাটাতেন। মহম্মদ বলতেন যে, ফেরেস্তা জেব্রাইল তাঁকে একদিন একবাটি আরক দেয় এবং তা পান করে মহম্মদের যৌন ক্ষমতা চল্লিশ জন মানুষের সমান হয়ে যায়।

হিন্দু ধার্মিক ব্যক্তিরা মরার সময় ভগবানের নাম করতে করতে মরবেন, এটাই স্বাভাবিক। গীতা বলছে, যে যা চিন্তা করতে করতে মারা যাবে, পরের জন্মে সে তাই হয়ে জন্মাবে। তাই আরবের নবী মহম্মদ কিভাবে ইন্তেকাল করেছেন তা জানতে পাঠকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। নবী মহম্মদের মৃত্যু বর্ণনা করতে বিবি আয়েশা বলেছেন—"আল্লার রসুল আমার পালার দিন, আমার ঘরে, আমার কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন, এবং মৃত্যু কালে তাঁর লালা ও আমার

লালা মেশামেশি হয়ে গিয়েছিল।" একজন কামনা-তাড়িত লোকেরই এভাবে মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। কোন হিন্দু ধার্মিক ব্যক্তি এইভাবে মারা গিয়েছেন বলে শোনা যায়নি।

ইরানের মুসলমান পন্ডিত ডঃ আলি সিনা-র মতে ইসলাম হল গভীরতম অন্ধকার, তাই তার পক্ষে আলো সহ্য করা সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে, বর্তমানে আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষিত যুবকরা বুঝতে পারছে যে, ইসলাম হল ঘৃণা, মিথ্যাচার, হিংসা, রক্তপাত ও যৌনতায় পরিপূর্ণ একটি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তাই তারা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করছে। কোন মুসলমানের পক্ষে ইসলাম ত্যাগ করা মহাপাপ, যার নাম মোরতাদ এবং এর শাস্তি হল মৃত্যু. তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রাণের ভয়কে উপেক্ষা করে মোরতাদ হচ্ছেন। একটা সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে যে, বিগত এক বছরে বৃটেনের ২ লক্ষ মুসলমান এবং আমেরিকার যুবা মুসলমানদের ২০ শতাংশ মোরতাদ হয়েছেন। এ রকম আরেকটি সমীক্ষায় বলা হচ্ছে যে, আফ্রিকায় গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৬০ লক্ষ মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করছেন। বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশের অনেক যুবা মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মোরতাদ হচ্ছেন এবং এঁদের একটি দল বিবৃতি প্রকাশ করে। সেই বিবৃতিতে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করার কারণ ব্যাখ্যা করেন। পরে এই বিবৃতিটি বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বি বি সি থেকে সম্প্রচার করা হয়।

সেই বিবৃতিতে বলা হয়, "One who claims to be a messenger of God is expected to live a saintly life. He must not be given to lust, he must not be a sexual pervert, and he must not be a rapist, a highway robber, a war criminal, a mass murderer or an assassin. One who claims to be a messenger of God must have a superior character. He must stand above the vices of the people of his time." অর্থাৎ, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের বার্তাবাহক বলে দাবি করবেন, তিনি অবশ্যই সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করবেন। তিনি নিশ্চয়ই কামার্ত বা বিকৃত যৌনরুচির মানুষ হবেন না। তিনি নারী ধর্ষণকারি কিংবা দস্যু হবেন না। তিনি অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী, বা গণহত্যাকারী, বা গুপ্ত ঘাতক হবেন না। যিনি নিজেকে ঈশ্বরের বার্তাবাহক বলে দাবি করবেন, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের মানুষ হবেন।

ওই বিবৃতিতে আরও বলা হচ্ছে, "Yet Muhammad's life is that of a gangster godfather. He raided merchant caravans, looted innocent people, massacred entire male populations and enslaved the women and children. He raped the women captured in war after killing their husbands and told his followers that it is okay to have sex with their captives (Quran 33:50). He assassinated those who criticized him and executed them when he came to power and became de facto despot of Arabia. Muhammad was bereft of humna compassion." অর্থাৎ, কিন্তু মহম্মদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিনি ছিলেন এক দস্যু দলের সর্দার বিশেষ। তিনি বণিকদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ ও লুঠ করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের ধনরত্ন লুটপাট করেছেন। তিনি সমগ্র একটি জনবসতির সমস্ত পুরুষদের হত্যা করে তাদের নারী ও শিশুদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছেন। তিনি সমগ্র একটি জনবসতির সমস্ত পুরুষদের হত্যা করে মহিলাদের বন্দী করে তাদের ধর্ষণ করেছেন এবং তার অনুচরদের বলেছেন যে বন্দী নারীদের ওপর যৌন অত্যাচার করলে কোন দোষ হয় না (কোরান-৩৩।৫০)। যখন তিনি আরবের একমাত্র ক্ষমতাশালী অত্যাচারী শাসক হয়ে উঠলেন, তখন তিনি তাঁর সমালোচকদের গুপ্ত ঘাতক দিয়ে হত্যা করিয়েছেন। মানুষের প্রতি অনুকম্পার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না।

উপরিউক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হচ্ছে, "Muhammad was a narcissist, like Hitler, Saddam or Stalin. He was astute and knew how to manipulate people, but his emotional intelligence was less evolved than that of a 6-year-old child. He simply could not feel the pain of others. He brutally massacred thousands of innocent people and pillaged their wealth. His ambitions were big and as a narcissist he honestly believed he is entitled to do as he pleased and commit all sorts of crimes and his evil deeds are justified." অর্থাৎ, হিটলার, সাদ্দাম হোসেন বা স্ট্যালিনের মত মহম্মদও ছিলেন একজন নার্সিসিস্ট। তিনি ছিলেন অতিশয় ধূর্ত এবং তিনি জানতেন যে, জনসাধারণকে

কি করে চালিত করতে হবে। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ছিল ৬ বছরের শিশুর মত এবং তিনি চালিত হতেন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের দ্বারা। অপরের দুঃখব্যথা বোঝার কোন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর উচ্চাশার কোন পরিমাপ ছিল না এবং নার্সিসিস্ট হিসাবে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং সকল প্রকার অপরাধ ও দুষ্কর্ম করার তাঁর অধিকার আছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যাঁরা মহম্মদ সম্পর্কে এইসব মন্তব্য করেছেন, তাঁরা অল্প কিছুদিন আগেও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং কেউ তাঁদের ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করেনি। তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম বর্জন করেছেন। কিন্তু কথা হল, বাংলাদেশের এইসব যুবা মুসলমানরা ইসলাম ও মহম্মদের কদর্য রূপটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হল, কিন্তু আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের অতিশয় শিক্ষিত সাধু মহারজারা তা আবিষ্কার করতে পারলেন না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, এইসব সাধুরা সব জেনে শুনেই মুসলমানদের তুষ্ট করতে এবং হিন্দুদের বিভ্রান্ত করতেই এইসব জঞ্জাল লিখেছেন। যাই হোক, বাংলাদেশের ইসলামত্যাগী মোরতাদরা যে সব কথা বলেছেন তার সত্যতা যাচাই করে দেখাটা আমাদের কর্তব্য।

বিগত ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুন মহম্মদ যখন কিছু মুসলমান অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় এলেন, তখন তাঁর বয়স ৫২ বছর। মহম্মদ ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক। তাই মদিনার লোকরা ভেবেছিল যে, নিশ্চয় একজন মহৎ চরিত্রের মানুষ হবেন। সেই কারণে ইয়াসরিব বা মদিনার অধিবাসীরা তাঁকে মদিনার শাসনকর্তার পদে মনোনীত করে। তখন মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। মদিনার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০ এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০০ মাত্র। পরে মক্কা থেকে মুসলমান আসার ফলে এবং মদিনার কিছু লোক মুসলমান হবার ফলে মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা বেশ কিছু বৃদ্ধি পেল। এর ফলে মহম্মদের শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। তিনি হয়ে উঠলেন মদিনার প্রধান শাসক, প্রধান বিচারক ও প্রধান সামরিক অধিকর্তা। এক কথায় মদিনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক বা মুকুটহীন রাজা। এত ক্ষমতা হাতে আসার ফলে তিনি তরোয়ালের সাহায্যে ইসলামের প্রসার ঘটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং জিহাদের তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। সেই অনুসারে তিনি তাঁর অনুগত মুসলমান এবং মক্কা থেকে আগত তাঁর চাচা হামজা ও চাচাত ভাই আলি, যুবায়ের ইত্যাদিদের নিয়ে একটা গুন্ডার

দল তৈরি করে ফেললেন। তারা জিহাদের নামে মদিনার অ-মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও দমন-পীড়ন শুরু করে দিল।

মক্কা থেকে যেই সব মুসলমানরা মদিনায় এসেছিল তাদের বলা হত মুহাজির বা উদ্বাস্তু। এই মুহাজিররা ছিল খুবই গরীব এবং মদিনার যে সব মুসলমানরা এই মুহাজিরদের সাহায্য করত তাদের বলা হত আনসার বা সাহায্যকারী। এই সময় মহম্মদ মদিনার অনেক গরীবকে টাকা পয়সা ঘুষ দিয়ে এবং অনেক ক্রীতদাসকে মুক্তিপণ দিয়ে মনিবের কাছ থেকে মুক্ত করে মুসলমান করা হত। মহম্মদের ধনী বন্ধু আবু বকরই এইসব খরচার সিংহভাগ বহন করতেন। কিন্তু তাতে কুলাতো না বলে খুবই অর্থাভাব ছিল। এই অর্থাভাব দূর করার জন্য মহম্মদ কয়েকটা উপায় স্থির করলেন। প্রথমতঃ ইহুদিদের মদিনা থেকে উৎখাৎ করে তাদের ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা ও জমি-জায়গা দখল করা। দ্বিতীয়তঃ মক্কার কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলা লুটপাট ও ডাকাতি করা। তৃতীয়তঃ মদিনার ধনী কাফেরদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা এবং চতুর্থতঃ মদিনার স্বচ্ছল মুসলমানদের ওপর বাধ্যতামূলক কর বা সদ্‌কা চাপিয়ে দেওয়া।

৬২২ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে মহম্মদ তাঁর চাচা হামজার নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজিরের একটি দলকে পাঠালেন কোরেশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা ডাকাতি করার জন্য। ওই কাফেলাটি সীরিয়া থেকে ফিরছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হল না। পরের বছর, ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মক্কার আবু সুফিয়ানের একটি বাণিজ্য কাফেলা লুট করতে মহম্মদ আর একটি দলকে পাঠালেন। কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। পরে তিনি আবু সুফিয়ান ও উমাইয়া বিন খালাফ-এর মিলিত বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাও ব্যর্থ হল।

সেই বছরই মহম্মদ মুসলমানদের একটি দলকে নাখলা নামক স্থানে পাঠালেন একটা বাণিজ্য কাফেলা লুট করার জন্য। সেটা ছিল রজব মাস। সেই সময় আরবে রজব, মুহারম, জিলকদ ও জিলহজ, এই চারটি মাসকে পবিত্র মাস বলে গণ্য করা হত এই চার মাসে যে কোন রকমের রক্তপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহম্মদের ইঙ্গিতে মুসলমানরা নাখলায় রক্তপাত ঘটাল। তারা দুজনকে হত্যা করল এবং প্রচুর লুটের মাল নিয়ে মদিনায় ফিরে এল। পরে আরও বেশ কয়েক বার মহম্মদ ও তাঁর লোকেরা কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলা লুটপাট করে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এইসব কারণেই বাংলাদেশের মোরতাদরা মহম্মদকে ডাকাত

(Highway robber) আখ্যা দিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, মদিনায় যখন মুসলমানের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেল তখন তারা মহম্মদের ইঙ্গিতেই মদিনার অ-মুসলমান কাফেরদের ওপর নানা রকমের জুলুম ও অত্যাচার শুরু করে দিল। কোরানে আল্লা বলেছেন, "আমি কাফেরদের অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করবো" (৮।৬০) এবং আল্লার সেই বাণীকে অনুসরণ করে মদিনার কাফেরদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে শুরু করে দিল। মদিনার লোকেরা যখন বুঝতে পারল যে, "এ তো খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে", তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সে সময় মদিনার কয়েক জন জনপ্রিয় কবি মুসলমানদের অত্যাচারের সমালোচনা করে এবং মদিনার লোকদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি মহিলা কবি আসমাকে গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে খুন করলেন। তারপর অপর দুই কবি আবু আফাক ও কাব বিন আসরাফকে হত্যা করলেন। পরে তিনি আরও অনেক ব্যক্তিকে গুপ্ত হত্যা করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সমস্ত কারণেই বাংলাদেশের মোরতাদরা মহম্মদকে গুপ্ত ঘাতক (assassin) আখ্যা দিয়েছেন।

মদিনায় যে সব ইহুদিরা বাস করত তারা তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যেমন বেনি কানুইকা, বেনি নাজির ও বেনি কুরাইজা। এই ইহুদিরা ছিল মদিনার সমৃদ্ধশালী ও ধনী এবং মদিনার কৃষিযোগ্য জমির বেশিরভাগই ছিল তাদের দখলে। তারমধ্যে বেনি কুরাইজারা ছিল সব থেকে ধনী সম্প্রদায় এবং তারা সোনা রূপার গহনা তৈরির কাজ করত। মদিনার আরবরা প্রায় সকলে এই ইহুদিদের জমিতে জনমজুরের কাজ করত। আগেই বলা হয়েছে যে, মহম্মদের উদ্দেশ্য ছিল এই ইহুদিদের মদিনা থেকে উৎখাৎ করে তাদের ধন-সম্পত্তি ও জমি-জায়গা দখল করা। তিনি তাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তার ফল খুবই মারাত্মক হবে। প্রথমে তিনি বেনি কানুইকাদের এমন ভয় দেখালেন যে, তারা তাদের জমি-জায়গা, সহায়-সম্বল ফেলে রেখে একটা উটের পিঠে যতটা মাল ধরে তাই নিয়ে মদিনা ছেড়ে যেতে বাধ্য হল।

এরপর এল বেনি নাজিরদের পালা। তারা মদিনার শহরতলীতে বসবাস করত। একদিন মহম্মদ তাদের এলাকায় গেলেন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে সত্ত্বর ফিরে এলেন। মদিনায় ফিরে মহম্মদ অভিযোগ আনলেন যে, ইহুদিরা ওপর থেকে

পাথর ফেলে তাঁকে মেরে ফেলার ফন্দি করেছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যাসত্য কোনদিন যাচাই করা হয়নি, মহম্মদ বানি নাজির ইহুদিদের অবিলম্বে মদিনা ছেড়ে চলে যাবার হুকুম জারি করলেন। বেনি নজিররা মদিনা ছেড়ে যেতে অস্বীকার করলে মুসলমানরা তাদের এলাকা ঘিরে ফেলল। ফলে ভয় পেয়ে বেনি নাজির ইহুদিরা মদিনা ছেড়ে চলে গেল। অনেকে মদিনার প্রায় ১০০ মাইল উত্তর খয়বর নামক স্থানে নতুন বসতি করল, বাকিরা সীরিয়ায় চলে গেল।

এরপর এল বেনি কুরাইজাদের পালা। ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদের সঙ্গে মক্কার কোরেশদের খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শেষ হলে মহম্মদ অভিযোগ আনলেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন কুরাইজা ইহুদিরা কোরেশদের সাহায্য করেছিল। এই অভিযোগের সত্যাসত্যও কোনদিন অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি। যাই হোক, মহম্মদ তাঁর অনুগত সদ্য মুসলমান সাদ-এর ওপর এর বিচারের ভার দিলেন। সাদ তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে রক্তাক্ত রায় দিল তাতে বলা হল, সমস্ত সক্ষম ও সাবালক পুরুষ ইহুদিদের হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হবে। রায় দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুরুষদের পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল এবং নারী ও শিশুদের আলাদা করে ফেলা হল। পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০। যে সব বালকের যৌনকেশ দেখা গিয়েছিল তাদের সাবালক বলে ধরা হয়েছিল। সেইদিন রাত্রে কুরাইজাদের ৮০০ সক্ষম পুরুষকে দিয়ে মদিনার বাজারে ৮০০ মানুষ মাটি চাপা দেবার মত বিশাল এক পরিখা খনন করা হল এবং একটা গুদাম ঘরে সেই ৮০০ ইহুদীকে বন্দী করে রাখা হল। অন্য দিকে স্তূপীকৃত করা হল লুটের মাল বা গনিমতের মাল যার এক পঞ্চমাংশের দাবিদার হলেন মহম্মদ নিজে। মহিলারাও লুটের মাল হিসাবেই গণ্য হল এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতী রিহানাকে মহম্মদ নিজের জন্য পছন্দ করে রাখলেন।

পরদিন ভোরে ফজর এর নামাজের পরেই শুরু হল কোতল পর্ব। ৫/৬ জন বন্দীকে ডেকে আনা হতে লাগল এবং সেই গর্তের কিনারায় তাদের উপুড় হয়ে শুয়ে পরতে বলা হল। এবং মহম্মদের চাচা হামজা এবং চাচাত ভাই তলহা যুবায়ের এবং আলি তাদের গলা কেটে গর্তে ফেলতে লাগল। ৮০০ নিরপরাধ মানুষের এই নির্মর গণহত্যা বর্ণনা করতে Sir W Muir তাঁর Life of Mahomet গ্রন্থে লিখছেন "The butchery began in the morning, lasted all day, and

continued by torch light till the evening. Having thus drenched the market place with the blood of seven to eight hundred victima and having given the command for the earth to be smoothed over their remains, Mohammad returned from the horrid spectacle to solace himself with the charms of Rihana, whose hunband and all her male relatives had just perished in the massacre." (Voice of India, New Delhi, p-319).

কুরাইজা যুবতী মহিলাদের মুসলমানরা নিজের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল এবং বয়স্কা মহিলা ও শিশুদের বেদুইন উপজাতির লোকেদের কাছে ঘোড়া ও অস্ত্র শস্ত্রের বিনিময়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হল। আগেই বলা হয়েছে যে, কুরাইজা সুন্দরী রেহানাকে নবী নিজের জন্য পছন্দ করে রেখেছিলেন। সারাদিন ধরে ৮০০ কুরাইজার কোতল পর্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে নবী ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে রেহানার সাথে শয়ন করতে চললেন এবং তাকে সেই রাত্রেই ধর্ষণ করলেন। বিখ্যাত মুসলমান লেখক আনোয়ার শেখ মহাশয়ের মতে সেই সময় ৮০০ কুরাইজার গণহত্যা আজ ৮০,০০০ নর হত্যার সমান। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের সামনে রয়েছে কি অমানবিক, পাশব ও দানবীয় আদর্শ। আর এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এই দানবীয় ও পাশব আদর্শকে অনুসরণ করেই দেশ ভাগের প্রাক্কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিতাড়ন হয়েছিল। এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই কারণেই বাংলাদেশের মানবতাবাদী মোরতাদ বন্ধুরা মহম্মদকে গণহত্যাকারী (mass murderer) বলেছেন এবং তাঁকে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' প্রবন্ধের লেখক কি করে লিখলেন যে, ''অপরদিকে মদীনার মুকুটবিহীন শক্তিধর মহানবীর জীবনে যাহা লাভ করিলাম তাহা একান্ত ক্ষমা ও দয়ার আদর্শ।'' যেই মহানবী, মদিনার মুকুটহীন রাজা এক দিনের মধ্যে ৮০০ নিরপরাধ ইহুদির গণহত্যা করলেন, তাদের ধন-সম্পদ, সহায়-সম্বল লুট করলেন, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করলেন এবং ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি করলেন, সেই নবী মহম্মদকে তিনি কি করে একান্ত ক্ষমা ও দয়ার আদর্শ প্রচারকারী বললেন তা এক আশ্চর্যের ব্যাপার। স্বামীজীর কথাতেই

তাঁকে ধিক্কার জানাতে বলতে হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত কাদা তুলে তাঁর মুখে ছুঁড়ে মারলেও তা যথেষ্ট হবে বলে মনে হয় না। তিনি যদি ভেবে থাকেন যে, এইসব মিথ্যা কথা বলে ইসলামের নবীর স্তুতি করলে তাঁরা কখনও মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত হবেন না, তবে তাঁর মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

তাঁদের জানা নেই যে, তাঁরা যে গেরুয়া পোশাক পরেন সেই গেরুয়া রঙ কাফেরের রঙ হিসাবে মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এবং এই গেরুয়া পোশাক পরার জন্য তাঁরা মুসলমানদের চোখে সাধারণ হিন্দুর চাইতে অনেক বেশি ঘৃণ্য। কিন্তু এইসব অজ্ঞ সন্ন্যাসীদের জানা নেই যে, মুসলমানরা যখন তাঁদের জিহাদ শুরু করবে, তখন তারা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের প্রথম আঘাত করবে। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজি যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে, তখন সে সবার আগে গেরুয়াধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করে। গত ২০০৮ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোরেরহাট গ্রামে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী পুণ্যলোকানন্দ মহারাজের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের বিবাদ বাধে। মুসলমান নেতা আব্দুর আলি আশ্রমের দুটি ঘর দখল করে তাতে চোলাই মদের ব্যবসা করার পরিকল্পনা করে। স্বামী পুণ্যলোকানন্দ বাধা দিলে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে গাছে বেঁধে প্রচন্ড মারধোর করে। ফলে স্বামী পুণ্যলোকানন্দজীকে কলকাতায় এনে এস এস কে এম হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়। মুসলমানদের চরমভাবে তোষণ করেও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা যে তাদের মন জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, উপরিউক্ত ঘটনা তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

তবে এইসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার যেটা সব থেকে সহজ সমাধান, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা কেন তা করছেন না, তা সত্যিই দুর্বোধ্য। তাঁরা সকলে দলবলে মুসলমান হয়ে গেলে আর কোন সমস্যাই থাকে না। সব ধর্মই যখন এক এবং যখন "বিশ্লেষণ করিলে বা ধর্মের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে যে, মূলগতভাবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই", তাহলে মুসলমান হতে তাঁদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশের লোক বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সত্যিই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সব ধর্মই এক এবং তাঁদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাঁদের আরও একটি বিশেষ সুবিধা হবে। তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হবেন এবং সরকারের কাছ থেকে অনেক বেশি বেশি

সাহায্য ও অনুদান পাবেন। কাজেই রামকৃষ্ণাইট পরিচয় দিয়ে সংখ্যালঘু সাজার আর প্রয়োজন হবে না। উপরন্তু তাঁরা আরও একটা বিশেষ সুবিধা পাবেন। মৃত্যুর পর আল্লার জান্নাতে যেতে পারবেন এবং সেখানকরা হুরী পরীদের সঙ্গে অঢেল যৌন সুখ ভোগ করতে পারবেন। আশাকরি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এই বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করে দেখবেন।

৮

''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' প্রবন্ধের লেখক তারপর লিখছেন, ''আমরা অবগত আছি, শ্রীরামকৃষ্ণ অবস্থানকালে রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে হিন্দু সন্ন্যাসীদের ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিগণের প্রতি সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত। সেই সূত্রে সুফি সাধক গোবিন্দ রায় তথায় আসিয়া সানন্দে দিনযাপন করিতেছিলেন। প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন : ''ঐ সময় (ইসলাম ধর্ম সাধনকালে) আল্লা মন্ত্র জপ করিতাম। মুসলমানদের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম; ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পরিতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম করা দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পর ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল।''

উপরিউক্ত বিষয়টা স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতে নেই। এমন কি, মহেন্দ্র গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃততেও নেই। একমাত্র স্বামী সারদানন্দ রচিত লীলা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ আছে। তাই সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, এইসব কথাবার্তার পিছনে কতখানি সত্যতা আছে। অপরদিকে, উপরিউক্ত বর্ণনার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতাই প্রমাণ করে যে, এই বিররণ সর্বৈব অসত্য ও স্বকপোল-কল্পিত। স্ববিরোধিতাগুলো নিচে দেওয়া হল :

১) একজন সুফি ফকিরও মুসলমান, তাই তার নাম গোবিন্দ কখনই হতে পারে না। তার আরবী বা ফার্শী নাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২) কেউ ইসলামে দীক্ষিত হতে চাইলে সর্বপ্রথম তাকে আরবী ভাষায় কলেমা আবৃত্তি করতে হবে এবং তা মুখস্থ করতে হবে। ইসলামে মোট ছয়টি কলেমা আছে. তবে প্রথম কলেমা, কলেমা তৈয়ব (লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদুর রসুলুল্লা) তাকে অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কলেমা মুখস্ত করেছিলেন কি না তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

৩) ইসলামে ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়ার কোন বিধান নেই। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ্ বা অবশ্য কর্তব্য এবং তার সময়গুলো হল— (ক) ফজর বা ভোরবেলা, (খ) যোহর বা দুপুরবেলা, (গ) আসর বা বিকাল বেলায়, (ঘ) মাগ্রিব বা সন্ধ্যা বেলায় এবং (ঙ) এশা বা রাত্রিতে। এই বিশেষ কয়টি সময় ব্যতীত অন্য সময় নমাজ পড়লে তাকে নফল নামাজ বলে এবং আল্লা সেই নামাজ গ্রহণ করেন না।

৪) শুধু আল্লা আল্লা জপ করলে বা ডাকলেই নামাজ হয় না। নামাজের বিশেষ কিছু নিয়ম কানুন আছে এবং তা পালন না করলে তাকে নামাজ বলা যায় না। এই নিয়মগুলো হল : (ক) নামাজীকে প্রথমে মক্কার দিকে মুখ করে, দু পায়ের মধ্যে দু ইঞ্চির মত ফাঁক রেখে দাঁড়াতে হবে এবং ঐভাবে দাঁড়িয়ে ঐ সময়ের নামাজের দোয়া ও নিয়ত (আরবীতে) মনে মনে পড়তে হবে। (খ) তারপর আল্লাহু আকবর বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও কনিষ্ঠা দিয়ে বাঁ হাতের কব্জিকে কষে ধরতে হবে। একে তাহরিমা বাঁধা বলে। এইভাবে দাঁড়িয়ে আর একটি দোয়া (আরবীতে) পাঠ করতে হবে। (গ) এরপর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে কোরানের প্রথম সুরা, সুরা ফাতিহা, আরবীতে মুখস্থ বলতে হবে। কোরানে মোট ১১৪টি সুরা বা অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক সুরায় কিছু বাক্য বা আয়াত আছে। সুরা ফাতিহায় মাত্র সাতটি আয়াত আছে। (ঘ) এরপর কোরানের কমপক্ষে তিনটি আয়াত আরবীতে মুখস্থ বলতে হবে। (ঙ) তারপর আল্লাহু আকবর বলে মাথা নত করে দুই হাতে দুই হাঁটু কষে ধরে রুকু করতে হবে এবং ঐ অবস্থায় আরবীতে বিশেষ দোয়া পাঠ করতে হবে। (চ) এই দোয়াপাঠ করতে করতে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহু আকবর বলতে বলতে বসে পড়তে হবে এবং সিজদা (মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম) করতে হবে। (ছ) সিজদা করতে করতে আরবীতে আর একটি দোয়া পাঠ করতে হবে এবং দোয়া পাঠ করতে করতে উঠে দাঁড়াতে হবে। (জ) তারপর আল্লাহু আকবর বলতে বলতে

দ্বিতীয় বার সিজদা করতে হবে এবং (ঝ) সিজদা শেষে আল্লাহু আকবর বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। (ঞ) এই ভাবে ১ রাকাত নামাজ পূর্ণ হবে। (ট) প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে পাঁচ ওয়াক্তে ১৭ রাকাত নামাজ ফরজ্।

৫) সকলেই স্বীকার করবেন যে, এইসব খুটিনাটি মেনে, আরবীতে দোয়া, নিয়ত ও কোরানের আয়াত মুখস্থ করে নামাজ করা শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না, কারণ এরজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। মাত্র তিন দিন ইসলাম সাধনা করে কারও পক্ষে সঠিক ভাবে নামাজ করা কখনোই সম্ভব নয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধনা ও নামাজ পড়ার গল্প সর্বৈব মিথ্যা এবং হিন্দুদের ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করার জন্যই এইসব রটনা করা হচ্ছে।

৬) যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তবে তিনি মুসলমান হিসাবেই মারা যেতেন এবং তাঁকে ইসলামি কবরখানায় কবরস্থ করা হত। কারণ ইসলামী শাস্ত্রমতে কেউ মুসলমান হবার পর ইসলাম ত্যাগ করলে মোরতাদ পাপ হয়, যার শাস্তি হল মৃত্যু। কাজেই, সেই অবস্থায় মুসলমানরাই শ্রীরামকৃষ্ণকে হত্যা করত।

৭) লেখকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ঐ সময় (ইসলাম ধর্ম সাধনকালে) আল্লা মন্ত্র জপ করিতাম। মুসলমানদের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পরিতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম করা দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পর ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল।" কিন্তু কোথা থেকে লেখক ঐ উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করেছেন তার কোন সূত্র লেখক দেননি।

৮) লেখকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ তিন দিন ইসলাম সাধনা করার পর ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত করেছিলেন। ইসলামী মতে ইসলামের সাধনফল দুটো, (১) অনন্ত স্বর্গবাস ও (২) অনন্ত নরকবাস। এই দুই সাধনফল ছাড়া ইসলামে আর কোন সাধনফল আছে বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। উপরন্তু, জীবিতকালে কেউ এই সাধনফল পায় না। আল্লা যেদিন কেয়ামৎ বা শেষ বিচার করবেন, সেইদিনই সবাই এই সাধনফল পাবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র তিনদিন ইসলাম সাধনা করে জীবিতকালেই সাধনফল হস্তগত করেছিলেন,

এই কথা ইসলাম বিরুদ্ধ ও সর্বৈব মিথ্যা।

৯) ইসলামী শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা গুরুতর পাপ। নবী মহম্মদ বলতেন যে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ মুসলমান যার সর্বাধিক সংখ্যক পত্নী আছে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেয়ামতের দিন তাঁর ইসলাম সাধনার যে সম্যক ফল হস্তগত করবেন তা হল আনন্ত নরকবাস।

১০) শ্রীরামকৃষ্ণ বেঁচে ছিলেন.....বছর। তার মধ্যে মাত্র তিন দিন যদি তিনি আল্লা আল্লা জপ করে থাকেনও, তবে তার কি গুরুত্ব আছে? কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিশেষ কোন দুরভিসন্ধি দ্বারা চালিত হয়েই ''জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'' প্রবন্ধের লেখক এই সামান্য ব্যাপারটাকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হিসাবে তুলে ধরতে প্রযত্ন করেছেন। এর আসল উদ্দেশ্য হল, বর্তমানে প্রচলিত বিকৃত সর্বধর্ম সমন্বয়ের অনুসরণকারী ভন্ড সেকুলারবাদী রাজনীতিকে সমর্থন করা এবং সেই সুবাদে সরকার থেকে আরও বেশি অনুদান, আরও বেশি টাকা হস্তগত করা। অর্থের লোভে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এত নীচে নামতে পারেন তা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আজ সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে যেই সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই জনসংখ্যা বাড়ছে, সে কারণগুলো হল,

১) স্বেচ্ছাকৃতভাবে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বর্জনের মধ্য দিয়ে জন্মহার বৃদ্ধি করা,

২) বহু বিবাহের সাহায্যে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া,

৩) জল স্রোতের ন্যায় বাংলাদেশী মুসলমানের অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং

৪) হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ।

এক কালে এই পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা ছিল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে সীমান্তবর্তী ৯টি জেলায় মুসলমানরা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে, অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার মুখে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান হল, এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে ভাগীরথী নদীর পূর্বে অবস্থিত সমগ্র এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে এবং তা বৃহৎ

বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন ভাগীরথী নদী হবে ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা। এই বিরাট ভূখন্ডের হিন্দুদের তখন আবার উদ্বাস্তু হতে হবে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পালিয়ে আসতে হবে। সেটাও হবে একটা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা এবং ক্রমে পুরো পশ্চিমবঙ্গটাই ইসলামী পশ্চিমবঙ্গে পরিণত হবে। হিন্দুর পক্ষে তা যে অতীব ভয়ঙ্কর হবে তা বলাই বাহুল্য।

সেই অবস্থায় হিন্দু ধর্ম, হিন্দুর ধন-প্রাণ ও হিন্দু নারীর মান-সম্মান চরমভাবে বিপন্ন হবে, কারণ ইসলাম হল হিন্দু ও হিন্দু ধর্মের চরমতম শত্রু। তখন একটি হিন্দু মন্দিরও রক্ষা পাবে না এবং হিন্দু দেবদেবীর সমস্ত বিগ্রহ ও হিন্দু গ্রন্থ ভস্মীভূত হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ মন্দিরও তখন রক্ষা পাবে না। তাদের সমস্ত মঠ মন্দির মসজিদ হবে এবং তাদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় পরিণত হবে। আসন্ন এই ঘোর বিপদের দিনে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের উচিত ভয়ঙ্কর এই বিপদ সম্বন্ধে হিন্দুদের সতর্ক করা এবং ইসলাম যে তাদের চরম শত্রু তা হিন্দুদের বুঝিয়ে বলা।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা তো তা করছেনই না, বরং ইসলাম ও মুসলমানদের হিন্দুর মিত্র বলে প্রচার করে হিন্দুদের চরমভাবে বিভ্রান্ত করছেন এবং তাদের আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এইভাবে তাঁরা হিন্দুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাঁরা যদি নিজেদের সংশোধন না করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সঠিক পথে ফিরে না আসেন তবে অদূর ভবিষ্যতেই যে এরজন্য চরম মূল্য দিতে হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

একদিন মুঘিসুদ্দিন নামে এক কাজী সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজসভায় আসে। আলাউদ্দিন তখন সেই কাজীকে জিজ্ঞাসা করল, ''খরজ গৌজার (জিজিয়া প্রদানকারী) এবং 'খরজ দিহ্' (বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর প্রদানকারী) হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্র মুসলমানদের কি রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ করে?'' জবাবে মুঘিসুদ্দিন বলে, ''তারা হল জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মী। জিজিয়া আদায়কারী মুসলমান কর্মচারী তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের উচিত হবে সসম্মানে ও বিনয়ের সাথে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা। সেই কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে নোংরা বা ধুলো ছুড়ে মারে তবে তাদের উচিত হবে হা করে তা গিলে ফেলা। এভাবেই তারা সেই কর আদায়কারীকে সম্মান দেখাবে। এইভাবে বিনয়ের সাথে কর দিয়ে এবং বিনা প্রতিবাদে নোংরা গিলে তারা বশ্যতার প্রমাণ দেবে এবং এর মধ্যে দিয়েই ইসলামের গৌরব ও মেকি ধর্মের (অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের) হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন এবং বলেন, ''তাদের সর্বদা পরাধীন করে রাখ''। হিন্দুদের এইভাবে সদা সর্বদা হীন করে রাখাই আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য, কারণ তারা আল্লার রসুলের (অর্থাৎ নবী মহম্মদের) চিরস্থায়ী শত্রু। তা ছাড়া আল্লার রসুল আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, ''তাদের হত্যা কর, লুণ্ঠন কর এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত কর''। তিনি বলে গিয়েছেন, তাদের হত্যা কর অথবা ধর্মান্তরিত কর, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ কর এবং দাসত্ব করতে বাধ্য কর''। ইসলামের মহান টীকাকার হানিফার মত হল, ''হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও'' (অর্থাৎ তাদের জিম্মী হিসাবে গণ্য কর), এবং আমরা সেই মহান হানিফাকেই অনুসরণ করি। অন্যান্য টীকাকারদের মতে হিন্দুদের সামনে দুটো রাস্তা, হয় ইসলাম, নয় মৃত্যু।''

(তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, জিয়া-উদ-দিন বারনি)

বিগত ৭০০/৮০০ বছরের মুসলমান পরাধীনতার আমলে হিন্দুরা কি বিরম্বনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, উপরিউক্ত কথোপকথন তার একটি প্রামান্য দলিল।

Author

The author, Dr. Radhasyam Brahmachari, M. Tech., Ph.D., is a brilliant scholar of science, studied at Vidyasagar College, Narendrapur Ramkrishna Mission and the University of Calcutta, with unique academic achievements at his credit. He is now serving the Department of Applied Physics, Calcutta University, as a Professor.

The learned author, despite being a man of science, is equally conversant in literary, historical and spiritual spheres, including Vedic philosophy and philosophies of other Indian schools. At present he is widely acclaimed as an outstanding authority in comparative studies of religions.

He is also a well-known writer of a large number of highly thoughtful books that are being appreciated by thinking men and women both in India and abroad. He is also a renowned columnist and his masterly writings frequently appear both in Bengali and English print media.

The Following are a few of the books authored by him :

1. ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা
2. মিথ্যার আবরণে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রী
3. মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা
4. ভারতীয় ইতিহাস-শাস্ত্র ও কালক্রম
5. ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত
6. ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা
7. পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা